দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে দিনাজপুর জেলা:

অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা বিভিন্ন সময়ে নানা বিবর্তনের বা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালে যা পুণ্ড্রদেশ, তাই পূর্ব মধ্যযুগে বরেন্দ্রভূমি বা বরিন্দ আবার মধ্যযুগে সেটি গৌড়বঙ্গীয়। মোটকথা সপ্তম শতাব্দী থেকে স্বতন্ত্র গৌড়রাজ্যের উদ্ভব হলে এই অঞ্চলের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এই সময়কাল থেকে দিনাজপুরের যে রূপান্তর ঘটে পরবর্তী সময়ে মোঘল আমলে বা অবিভক্ত বাংলার রূপান্তর ছিল বেশ স্বাতন্ত্র্য। দেখা যায় যে, মোঘল আমলেও এই অঞ্চল উক্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তখন এই অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল একটি বড় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণের পর দিনাজপুর অঞ্চলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যাস্ত হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ রাজের অধীনে চলে আসে। সেই সঙ্গে এই ব্রিটিশ সরকারের আমলেই দিনাজপুর জেলার স্থায়ী প্রশাসনিক অবয়ব (১৭৮৬ খ্রি:) গড়ে ওঠে এবং বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার আয়তনের নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ছাপ স্থিরীকৃত হয়। তাই মোঘল যুগের তুলনায় কোম্পানীর আমল থেকে দুই দিনাজপুর অঞ্চলের প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রশাসনিক পরিবর্তনের কারণে ব্রিটিশ আমলে বৃহত্তর দিনাজপুরের জেলাগুলি ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয়েছে, তবুও এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বাংলার আবহমানকালের আর্থ-সামাজিক ধারাবাহিকতায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনি।

মোঘল আমলে বাংলায় সামন্তবাদ বিকশিত হয়ে চরম আকার লাভ করে। এর দরুণ জমিদার, তালুকদার, জায়গিরদাররা প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। মোঘল শাসকরা বড় জমিদার বংশগুলিকে স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রভাবের উৎস হিসেবে শক্তিশালী করে তোলেন। অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় কোম্পানীর আমলে জমিদারের সব ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কেড়ে নিয়ে শুধুমাত্র ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারদের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত কালেক্টরেট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এক নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা সূচিত করে। মোটকথা মোঘল আমলে সারা বাংলাদেশে বড় বড় জমিদারদের মাধ্যমে যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা হয় তা কোম্পানী শাসকদের দ্বারা সে সব জমিদারি ব্যবস্থাপনা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং এর মাধ্যমে দিনাজপুরের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় আধুনিক ইতিহাসের সূচনা হয়।[১] আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি যে,

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে দিনাজপুর জেলা তাদের শাসনাধীনের অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত জমিদার, জোতদার ও মহাজন শ্রেণি গ্রাম বাংলায় এক ভয়ানক চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়। সেই সময় বাংলার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় এক অসহায়তা অরাজকতা, অনিশ্চয়তা ও লুণ্ঠন পর্যন্ত দেখা দেয়। অর্থাৎ দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানী শাসকেরা রাজস্ব আদায়ের সুবাদে জমিদারি অনবরত নিলামে চড়ানোর ফলস্বরূপ বিক্রি হয়ে যেতে থাকে। এর দরুণ লক্ষ্য করা যায় নতুন নতুন জমিদারবর্গ সেই টাকা আদায় করার জন্য কৃষকের উপর জুলুম করতে শুরু করে। এমনকি বর্ধিত হারে খাজনা পরিশোধ করতে কৃষকেরা অপারগ হলে জমি থেকে উৎখাত হয় এবং বহুবিধ নিপীড়নের ফলে কৃষককুল বনে জঙ্গলে পলায়ন করে। এইভাবে পুরাতন ভূ-স্বত্ত্বের জায়গায় নতুন ভূমিসত্ত্ব গড়ে ওঠেছিল এবং এর ফলে সহস্র বছরের গ্রাম সভা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এমনকি সমগ্র বাংলার জেলা তথা গ্রামের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই অরাজকতার কবলে পড়ে বলি হয়।

দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মূলত: গ্রামীণ অর্থনীতির সংগঠন ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই সংগঠনিক কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়নি। বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি যখন এই অঞ্চলের উপর বিভিন্ন সময়ে নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল তখন থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়তে দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃহত্তর দিনাজপুরের কৃষি-অর্থনীতি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্বন্ধনীয় ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দিনাজপুরের মূল শিল্পই কৃষি। তাই লক্ষ্য করা যায় এখানে কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে ওঠে। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব দিনাজপুরের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়। অর্থাৎ এই সময়ে চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্তের ফলে দেখা যায় যে, দিনাজপুর রাজ-এস্টেটের সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটে এবং এই নতুন ভূমি ব্যবস্থার হাত ধরে দিনাজপুর রাজ-এস্টেটের নিলামি জমি পত্তনি নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে বণিক, মহাজন, গোমস্তা, বেনিয়ান ও দালাল এসব মধ্যস্বত্ত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। তার দলে ভূমির উপর কৃষকের অধিকার নিশ্চিহ্ন করে জমিদার ও নতুন রাজন্যবর্গের অধিকার স্থাপিত হয়। এমনটি পরবর্তীকালে মূলস্বত্ত্বভোগী জমিদার গোষ্ঠীদের সহকারী রূপে 'তালুকদার', 'জোতদার' প্রভৃতি উপস্বত্ত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় দিনাজপুরে কৃষিযোগ্য জমির তুলনায় আবাদের পরিমাণ কমে যায় এবং সেই সঙ্গে আবাদি জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা

আরও হ্রাস পেয়ে যায়। ভূস্বামীরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কৃষকদের নিজেদের জমিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে এবং এইসব কৃষকের দলপতিকে তারা খুশি রাখার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা যায়। প্রভাবশালী এই কৃষক দলপতিরাই কৃষি-অর্থনীতির মূলস্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা জমিতে মধ্য শ্রেণির এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সংকট দেখা দেয়। দিনাজপুর রাজের বিশাল জমিদারী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নিলাম হয়ে যায়। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এর ফলে উদ্ভুত নব্য জমিদাররা তাদের নব্য বাবু সম্প্রদায় যথা— ব্যবসা, জমিদারি আমলা, বৃত্তিজীবি ও শেষোক্ত সম্প্রদায় লটদার তাদের বেশির ভাগ জমিদারির প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ নায়েব, গোমস্তা এবং খাজনা আদায়ের জন্য ইজারাদারদের হাতে অর্পণ করেন। বস্তুত তারাই হলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এমনকি এই জমিদাররাই হয়ে উঠলেন অনুপস্থিত ভূস্বামী। শুরু হল নানাবিধ শোষণ, প্রজা নিপীড়ন, অত্যধিক হারে খাজনা আদায়, নানারকম অন্যায় ও অত্যাচার। যেহেতু নায়েব, গোমস্তারা ছিলেন জমিদারের প্রতিভূ, সেহেতু ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধিতে তারাই গ্রামীণ সমাজে কর্ণধারের ভূমিকা পালন করতেন।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে যখন জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সেই সঙ্গে ভূমি রাজস্বের হার সুনির্দিষ্ট না থাকার সুবাদে তখন শোষণের বৈচিত্র্য ছিল আলাদা। বেশী উৎপাদন তখনই লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে যখন এই উৎপাদিত পণ্য সঠিক মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হবে। কোম্পানীর আমলে প্রথম পর্বে স্থানীয় বাজারে শস্যের চাহিদা সামান্যই ছিল।[২]

সেই সময়কালে কৃষি নির্ভর দিনাজপুর জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান অর্থকরী ফসল হল ধান এবং চাষযোগ্য মোট জমির বিরাশি ভাগ জমিতে ধানের চাষ হত। এছাড়াও কৃষিজাত ফসলের মধ্যে পাট, গম, যব, সরিষা, আখ, আদা, পান, নীল প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এফ. ডব্লিউ স্ট্রং সাহেব তাঁর দিনাজপুর গেজেটিয়ারে দিনাজপুরের কৃষি অর্থনীতির বিষয়ে অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। West Bengal District Gazetteer-এ সেই সময়ে কৃষিজাত ফসলের একটি তালিকা সুস্পষ্ট রূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে— "The major crops grown in the district are aman, aus and boro paddy, jute and mesta mustard mashkalai (rabi) barely, gram, potato, lenseed, mashkalai (kharif) and sugar-cane".[৩] জমির প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদনের সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি জীবীদের দুভাগে ভাগ করা যায়— কৃষিজীবী এবং কৃষিজীবী পাইকার। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তর অংশের বেশির ভাগ অঞ্চলের মাটি ছিল পলি শ্রেণির। এই পলি অঞ্চলের বালু মিশ্রিত

মাটিতে আর্দ্রতার ফলে সারা বৎসর ফসল ফলত। তাই ফসল ফলানোর সুবিধার দরুণ এই অঞ্চলের জমির মালিকের হালের বলদ, কৃষি মজুর, মজুত শস্য ভাণ্ডার উৎপাদনের ক্ষেত্রে চলতি পুঁজি হিসেবে ব্যয় হত। তাই এই অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষদের সব ঋতুতেই কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশের মাটি ছিল ক্ষার প্রকৃতির। এই ক্ষিয়ার অঞ্চলে কেবলমাত্র আমন বা হৈমন্তিক ধানই উৎপন্ন হত। বছরের অন্যান্য সময় কৃষিজীবীরা এখানে গরু-বলদ শস্য বহনের কাজে এবং কৃষি শ্রমিকরা পণ্য বহনের কাজে যুক্ত রাখত। তাই এই অঞ্চলের কৃষিজীবীরা উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করত, আর কৃষি শ্রমিকেরা খোরাকির ধানও বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করত। এই সুযোগ দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে অনেকেই কৃষিপণ্যের পাইকারী কারবার করত। বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার কারণে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই বাণিজ্যিক স্বার্থের দরুণ দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজীবীদের বর্গাদারী বা ভাগ-চাষ প্রথায় অনাবাদী ও পতিত জমি উৎপাদনে নিয়োজিত করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের ভাগচাষের পেছনে আর্থিক কারণটির মূলে ছিল চাষের লাভ-লোকসান সমানভাবে ভাগ করা। আবার লক্ষ্য করা যায় উত্তরাঞ্চলের মাটির উর্বরতা কম এবং বন্যার ফলে প্রায়ই ফসলের ক্ষতি হয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির উদাহরণ বিরল। এছাড়াও কৃষিজীবী-পাইকারদের কাছে নগদ অর্থ বেশী থাকায় তারা পাইকারী ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনি কারবারে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। দিনাজপুরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে মাটির এই শ্রেণিবিভাগ মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কেও পার্থক্য ঘটায়।[৪] দিনাজপুরে ভূমি রাজস্বের হার নির্ধারিত হত মূলত আবাদী জমিতে কোন্ কোন্ ফসল বোনা হয়, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপন্ন ফসলের সম্ভাব্য দামের উপর এক মহান হিসেবে এই খাজনার মোট পরিমাণ হিসেব করে এই মহালের এক বা একাধিক দলপতি কৃষকের উপর আদায়ের ভার দেওয়া হত। এদের কেউ কেউ 'হুজুরী জোতদার' নামে পরিচিত ছিলেন। এরা সদরে সরাসরি খাজনা জমা দেওয়ার অধিকার পায়। আবার দেখা যায় ইজারা প্রথায় রাজস্ব আদায় করা হত এবং কাটকিনদার বা দর ইজারাদার নামে এরা পরিচিত ছিল। তাছাড়াও সে সময়ে জমির পরিমাণ ভিত্তিক নির্দিষ্ট হারে খাজনা ও উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমেও খাজনা প্রদানের সুযোগ ছিল। তাছাড়া সে সময়ে জমির মোট আয়তন অনুযায়ী খাজনাদার পরিমাণ স্থির করারও ব্যবস্থা ছিল যা 'শুহুদি রাজস্ব ব্যবস্থা' নামে পরিচিত লাভ করে। এ ব্যবস্থায় ভূস্বামী আবাদ বাড়িয়ে খাজনার দায় পরিশোধ করতে পারত। আবার সম্প্রসারণের কথা মাথায় রেখে ভাগচাষে জমি দেওয়া অধঃস্তন রায়তি সৃষ্টি করা ও দিনাজপুরের অনেক জমিকেই সে সময় আদিবাসীদের চাষযোগ্য করে ফসল ফলাতো। এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দিনাজপুরে পতিত জমি বা প্রকৃত অর্থে আনাবাদী জমি আবাদী হয় এবং

অনেক পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিবর্তিত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বৃহত্তর দিনাজপুরের কৃষি উৎপাদনের যে, সাংগঠনিক রূপ ধরা পড়ে তাতে লক্ষ্য করা যায়, এই সময় মুখ্য কৃষিজীবী ছিলেন জোতদার। এই জোতদার সমাজে বেশ প্রভাবশালী ছিল। এদের বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ ছিল। এমনকি প্রভাবশালী জোতদারের অধীনে যথেষ্ট সংখ্যক কৃষক ও অন্যান্য কৃষি শ্রমিক থাকত। তার ফলে বড় জোতদাররা ভূস্বামীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে জোতদার শ্রেণি থেকে দিনাজপুরে মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, কৃষিপণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দর এবং বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার কারণে আর্থিক পরিবেশের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, এমনকি কৃষি জীবনযাত্রা লাভজনক জীবিকায় পরিণত হয়। সমৃদ্ধশালী বৃহৎ জোতদাররা এ সুযোগ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে। কৃষি-অর্থনৈতিক অবস্থার এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ লক্ষ্য করা যায় আবাদী জমির চাহিদা বৃদ্ধি এবং পরোক্ষ ফল অধঃস্তন রায়তী স্বত্ত্ব সৃষ্টি করা। প্রথম ধাপের অধস্তন রায়ত হল চুকানীদার। জোতদাররা যতই চুকানীস্বত্ত্ব সৃষ্টি করতে থাকেন ততই সে মধ্যস্বত্ত্ব ভোগী হিসাবে গণ্য হতে থাকেন। এর ফলে ভাগচাষের (Share croper) মাধ্যমে আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আর্থিক অবস্থার দিক দিয়েও ভাগচাষী তথা বর্গাদারের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলের ভাগচাষী আমন ধান উৎপাদন সহ অন্য সময় খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের বাণিজ্যের সাহায্যে অতিরিক্ত উপার্জন করে থাকে। তুলনায় উত্তরাঞ্চলের ভাগচাষীদের কাছে সুযোগ ছিল না। তারা সারা বৎসরে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকলেও এতদ্ অঞ্চলে জমির উর্বরতা শক্তির অভাবজনিত কারণে এদের ভাগ পরিমাণে কম থাকায় তারা আর্থিক দিক থেকে শোচনীয়ভাবে বেঁচে থাকত। দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলের ভাগচাষী তথা আধিয়ারদের কাছে এই কারণটি ১৯৪০-র দশকে তেভাগা আন্দোলনের পক্ষে শ্রেণী সচেতনতার অভিমুখে ধাবিত করেছিল। দিনাজপুর জেলার কৃষি অর্থনীতিতে উদ্ভুত এই জীবন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সূত্র ধরে দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬ খ্রি:) কৃষি-অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল, যার ফলে কৃষকদের ফসলের অধিকারের দাবি পূরণ হয়েছিল। তবে দিনাজপুরে যে কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠে তার ভিতরে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। বিশেষ করে এই অঞ্চলের জমিদাররা উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলেন। আর কৃষকরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় মুসলিম। এর ফলে জমিদার ও প্রজা তথা উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক তারতম্য ছিল। আবার উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশে জোতদার ও আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় না। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এতদ্ অঞ্চলের জোতদার ও আধিয়ারদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের

বাতাবরণ বজায় ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে জোতদারের ঊর্ধ্বসীমা (১৭.২৯ একর) নির্দিষ্ট হওয়ার পর এবং 'ভেস্ট' জমি কৃষকের হাত থেকে মাঝারি জোতদারের নিকট হাত বদল হবার ফলে দেখা যায় যে, দিনাজপুর শহর জেলার ভূমিহীন কৃষকরা শ্রমিকের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলেন। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক কালে কৃষিতে ধীরে ধীরে যন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকায় কৃষি শ্রমিকরা দিনমজুর হয়ে কাজের খোঁজে গৃহস্থের দরজায় ভিখারির মতো করে ঘুরতে লাগল।[৫] মোটকথা দিনাজপুরের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে জমিদারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, অপরদিকে সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা জোতদার হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলস্বরূপ সৃষ্টি হতে দেখা যায় মধ্যস্বত্বভোগী আধিয়ার,বর্গাদার, ভাগচাষী, (Share croper) ইত্যাদি নানা শ্রেণী। পাশাপাশি জমির চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জীবনেও জমিকে কেন্দ্র করে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক জনজীবনেরও গতিপ্রকৃতির মধ্যেও নানারকম ধারা লক্ষ করা যায়। তাই উত্তরবঙ্গে দু'রকমের কৃষক ছিল— বর্গাদার বা ভাগচাষী (Share croper) এবং ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষেতমজুর—যার একটি বাস্তব নিদর্শন দিনাজপুর জেলাতেও বিরাজমান। তবে পরবর্তীকালে এই জমি রাজনৈতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। তাই তৎকালীন সময়ে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি এই জমিকে ভিত্তি করে নিজেদের স্বকীয় মতাদর্শের প্রয়োগ ঘটায়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে জমিকে নিয়ে নতুন ভাবনা অর্থাৎ ভেস্টজমির আইনকে মান্যতা বা বাস্তব রূপ দেওয়া শুরু হয়। এমনকি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অপারেশন বর্গার প্রয়োগের ফলে অর্থাৎ প্রকৃত বর্গাদার বা ভাগচাষীকে বিনা শর্তে তার অধীনভুক্ত বর্গা জমি রেকর্ড ভুক্ত করার মাধ্যমে জমিকে নিয়ে নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। যা স্বাধীনতা উত্তরকালের কৃষিভিত্তিক জনজীবনকে নতুন মাত্রা প্রদান করে। বস্তুত স্বাধীনোত্তর পর্বে দিনাজপুর জেলায় শিল্পায়নের বাস্তব ভিত্তি খুবই সামান্য থাকার সুবাদে দিনাজপুরের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় কৃষিই এ জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জীবিকা হিসেবে কার্যকারী বা প্রধান ভূমিকা পালন করে। মোটকথা ঔপনিবেশিক তথা ব্রিটিশ যুগের কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও সম্প্রতি কৃষি ও নগর সভ্যতার মিশ্রণে দিনাজপুর জেলার নাটকে যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তবোচিত সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে তা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ তথা ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এখানে তুলে ধরবো, যাতে করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তবোচিত সত্য অবস্থার জীবন্তরূপ আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় সৃষ্ট নাটকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট:

উত্তর দিনাজপুর জেলায় নাট্যাভিনয়ের প্রথম পর্বে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ফর্মের চেয়ে যাত্রার ফর্মের প্রভাব ছিল যথেষ্ট সক্রিয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মর্যাদা প্রাধান্য পেয়েছিল, মোটকথা যাত্রাপালার প্রভাবজনিত কারণে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকই অভিনীত হত। সামন্তপ্রভুরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যেতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না, প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার দেশাত্ববোধক নাট্যাভিনয় এই জেলার নাট্যমঞ্চে সম্ভবত মঞ্চস্থ হয়নি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর জেলার মঞ্চে কলকাতার পেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলির মঞ্চ সফলতার উপর নির্ভর করে কালিন্দী, উল্কা, সাহেববিবি-গোলাম, দুই পরুষ প্রভৃতি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের মঞ্চাভিনয় হয়েছিল তবে স্থানীয় সমস্যামূলক কোন বিষয় নিয়ে নাটক রচিত হতে দেখা যায়নি এবং প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র এই জেলার নিজস্ব প্রখ্যাত নাট্যকার ড. বৃন্দাবন বাগচির রচিত কয়েকটি মৌলিক নাটক 'এক ডোরে বাঁধা', 'আকাশ ভরা তারা' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক প্রকাশিত হলেও এই নাটকগুলিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার নিজস্ব সমস্যা কেন্দ্রিক ঘটনার নাট্যপ্রয়াস ছিল না। তবে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চে গ্রুপ-থিয়েটারের ফর্মে মঞ্চায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই গ্রুপ-থিয়েটারের দৃষ্টিতে নাটক কেবল সখ-সৌখিনতা উদ্‌যাপনের শিল্পায়ন নয়, এর মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটিও ফুটিয়ে তোলা দরকার। এমনকি নাট্য-প্রয়াস কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম। রায়গঞ্জের এরূপ একটি বলিষ্ঠ-গ্রুপ থিয়েটার হল 'ছন্দম' নাট্যসংস্থা। এই ছন্দম নাট্যসংস্থার সঙ্গে বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, তরুণ নাট্যসংস্থা প্রভৃতি অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার সংস্থার সচেতন মঞ্চ-প্রয়াস বর্তমানেও ক্রিয়াশীল। রায়গঞ্জের এই গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যেই ছন্দম গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা তাদের নিজস্ব নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে জেলার স্থানীয় সমস্যামূলক বা নিজস্ব সমস্যা-বিজড়িত বিষয় বিশেষ করে জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার সক্রিয় প্রয়াস করে চলেছেন। এই সংস্থার সুঅভিনেতা, নাট্য-পরিচালক ও নাট্যকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিতোষ চন্দ্রগুহের গল্প অবলম্বনে গোধূলী নাট্যরূপ দেন এবং এই নাটকটি গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় (৩৭বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১৫ খ্রি:) প্রকাশিত হয়। এই গোধূলী নাটকে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার শ্রীমতি (ছিরামতি) নদীতে সেতু তৈরির কাজকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষদের দিনমজুরী কাজের ফাঁকে তাদের অভাবজনিত দৈনন্দিন জীবনের আর্থ-সামাজিক করুণ চিত্র, ঠিকাদারের অবৈধ উপার্জন, দেশের জনগণের উন্নয়নের কাজে উপর থেকে নীচু তলার দুর্নীতির বিশ্বস্ত চিত্র ও সেই সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী

বুদ্ধিজীবীরা দেশের সমস্যা সমাধানের চেয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। ছন্দম নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় এই সংস্থার সদস্য ও নাট্যকার সুব্রত রায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ 'যতীন বাবুর চাকর' ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ছন্দমের প্রযোজনায় নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এ জেলায় সামন্তপ্রভু তথা জোদ্দারদের নিষ্ঠুর শোষণ চক্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সামগ্রিক ও বাস্তব সম্মত চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

'গোধূলী' নাট্যরূপ দিয়েছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিতোষ চন্দ্র গুহের রচিত 'গোধূলী' গল্পের কাহিনী অবলম্বনে। এই গোধূলী নাটকের কাহিনিতে লক্ষ করা যায় উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার শ্রীমতি (ছিরামতি) নদীর উপর সেতু নির্মাণের Constraction -এর কাজকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা রেজিন বা দিনমজুরীর কাজে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব তাড়িত রোজনামচার আর্থ-সামাজিক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে কৃষিকাজ থেকে সারাবছর তাদের ভরণপোষণের সু-ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে তারা শ্রমিক পেশায় যুক্ত হচ্ছে। 'চৌধুরী কনস্ট্রাকশন' একটি বোর্ড ঝুলিয়ে চৌধুরী ঠিকাদার ফার্ম এর মালিক ঠিকেদার সুবল চৌধুরীর একান্ত বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সহযোগী কর্মচারী নিখিল কর্মকার উক্ত ফার্মের ওয়ার্ক সাইট-এ কাজ কর্ম দেখভাল করেন এবং এই নিখিল কর্মকারের স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো নয় এবং সে কর্মরত যুবতী রেজিনদের অভাবের সুযোগে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে পছন্দমতো মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করে। আবার এই নিখিল কর্মকারের সঙ্গে ওভারসিয়ার অতুল ভৌমিকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মস্তান ঠিকেদার সুবল চৌধুরীর এই কাজের টেণ্ডার পাওয়ার ব্যাপারে অবৈধ পাওনা-গণ্ডা দেওয়া, কন্‌স্ট্রাকশন সাইট-এ স্পেসিফিকেশন মতো মাল মেটেরিয়ালস্ না দেওয়া, বাড়তি সিমেন্ট ও লোহা বাজারে বিক্রি করা, মেজারমেন্ট-এ কারচুপি এমনকি জনগণের টাকা তছনছ করে আত্মসাৎ করার মাধ্যমে জেলা তথা সমগ্র বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বাস্তব চিত্র বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ দেশের জনগণের উন্নয়নের কাজের উপর থেকে নীচু তলার দুর্নীতির হাল হকিকৎ আমাদের হতবাক করে তোলে। সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির দৌরাত্মে ব্যস্ত অথচ দেশের সমস্যা সমাধানে তাদের মাথা ব্যথা নেই, এর মধ্য দিয়ে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

এই নাটকের শুরুতে কালিয়াগঞ্জ থানার সাধারণ গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে গোধূলী ও হরো নামে এক স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে তাদের দৈনন্দিন অভাব অর্থাৎ হরো মদ খেয়ে নিজের শরীর ও সংসারে অভাব ডেকে আনে, স্বামীর সামান্য জমি থাকায় বাধ্য হয়ে রেজিন

দিনমজুরীর কাজ সততার সঙ্গে করে গোধূলী সংসার চালায় ও স্বামীর চিকিৎসার জোগান দেয়। এতদ্ সত্ত্বেও স্বামী তাকে সন্দেহের চোখে দেখে ও খোঁটা দেয় এই বলে যে, ''তোকে মুই রেজিন খাটবা মানা করি, তুই যাস কেনে? মরদ কুলকামীন আর মিস্ত্রিগুলার সাথে মসকরা, ঢলাঢলি মোর ভালো লাগেনি। শ্যেষমেস তুই একটা ছিনাল হই গেলু।'' মোটকথা স্বামী তাকে 'ছিনাল' অর্থাৎ দর্জাল বা চরিত্রহীন মেয়েছেলে বলে খোঁটা দেওয়ায় গোধূলী হরোর সংসার ছেড়ে দিয়ে বাবার বাড়িতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় হরো গোধূলীর সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে ও অসুস্থ হয়ে যায়। তাই শেষপর্যন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে গোধূলী স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়ি না গিয়ে বরং স্বামীকে ঠাঁটিয়ে বাজিয়ে নিলেন এই বলে—

গোধূলী— মোক শুধু শুধু পিটালেন কেনে?

হরো — আরে পাগলি, মুই মারোনি। ওই পেসমাদটা তোকে মারিলে তোক মুই কেতো ভালোবাসি।

গোধূলি — মিছাই। মদ খালি ফির পিটাবেন।

হরো — ঠিকছে, মদ আর খামো নি। ই-তোর মাথাত হাত রাখি প্রিতিজ্ঞা করনু।

গোধূলি— মিছাই কহছেন না তো। বুঝনু মোক ভুলাবা চাহছেন।

হরো — ফির মোক ছাড়ি চলি যাবেনি কহেন?

অর্থাৎ হরো সংসারের অভাবে ও কষ্টে দিনমজুরীর কাজ করে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর স্ত্রী গোধূলীকে কথা দেয় সে, পেস্মাদ (মদ) খেয়ে সে আর গোধূলীকে পিটাবে (মারবে) না, এমনকি সে গোধূলীর মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিন তার ভুল হবে না এবং গোধূলীকে তাকে ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করে। মোটকথা, সাধারণ গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার অভাবের নিদারুণ কঠোর গ্রাসে জর্জরিত। এই নাটকে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার গ্রামের সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক জীবন নিস্পেষিত। সেই জীবন্ত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর বাস্তব চিত্র এখানে নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

এরপর প্রসঙ্গক্রমেই এই চৌধুরী কনস্ট্রাকশন'-এর বিশ্বস্ত কর্মচারী নিখিল কর্মকারের সঙ্গে ওভারসিয়ার অতুল ভৌমিকের চৌধুরী ঠিকাদারী ফার্মের 'ওয়ার্ক সাইট'-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অতুল ভৌমিক জানালেন যে এ কাজের টেন্ডার পাশ করাতে সাধারণ আমলা থেকে নেতা অফিসার পিওন পর্যন্ত উপঢৌকন (উপরি পাওনা) প্রদান, আর তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঠিকেদার স্পেসিফিকেশন অনুসারে মেটেরিয়ালস কম দিয়ে উদ্বৃত্ত সিমেন্ট লোহা বাজারে সুবিধামতো

বিক্রি করেন। মোট কথা মেজারমেন্ট কারচুপি করে এই ঠিকেদাররা জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে। আমজনতার উন্নয়নের কাজে এই দুর্নীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় গেঁথে বসেছে। তাই ক্ষোভের সঙ্গে অতুল বাবুল বললেন, উপর তলার দুর্নীতি দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে নিজেই এই পাঁকে পড়লাম। এই বিষয়কে সমর্থন করে নিখিল কর্মকার অতুল বাবুকে বলেন— ''আরে এইটা কী কইলেন। না, না, এরজন্য মন খারাপ করে না। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে হইলে মনটা শক্ত করন লাগে। ওই ইংরেজের থিকা এইটা জিনিস আমরা খুব ভালো শিখেছি— দুর্নীতি। ওগো দ্যেশে থিকা তাড়াইছি বটে, কিন্তু ওগো দুর্নীতিটারে আমরা রাষ্ট্রীয়করণ কইরা নিছি। তাইতো দিল্লীর মসনদ থিকা জিলা পরিষদ, পৌরসভা, পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত এর অবাধ বিচরণ। কী কন?'' অর্থাৎ দুর্নীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে? যা মানুষকে ভোগবাদী করে তুলছে। এর ফলে গরীব মানুষ গরীব হচ্ছে এবং বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে। মোটকথা সমস্ত বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়নের প্রবল প্রভাব জায়গা করে নিয়েছে। এই উন্নয়নমূলক কাজের অধিকাংশ টাকাই আই এম এফ, ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক এর বিভিন্ন স্কীম থেকে আসে এবং এমন সব শর্ত আমরা মেনে নিয়ে এগুলি নিচ্ছি যাতে করে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মুখ থুবড়ে পড়ছে। এমনকি এই ভোগবাদ, বিশ্বায়নের কবলে পড়ে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীরাও দেশের উন্নয়নের নাম করে নিজেদের আখের গোছানোর ব্যাপারে তৎপর। এছাড়াও প্রশাসনিক স্তরের উর্ধ্বতন কর্তাদের দায়িত্বের পাশাপাশি ঘুষ নেওয়ার প্রবণতা অধিকমাত্রায় বেড়ে চলেছে। এর ফলে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সেই তিমিরেই থেকে আছে। নাট্যকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই 'গোধূলী' নাটকে জেলাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশের এই চিরায়ত সমস্যাকে বেশ নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

নাটকের পরিণতিতে লক্ষ করা গোধূলী অসুস্থ্য স্বামীকে অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও বাঁচানোর তাগিদে গ্রামের হাসপাতালের বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখালে ডাক্তার বাবু জানায়— ''তোমার স্বামীর পেটে ঘা হয়েছে— রক্ত, পায়খানা পরীক্ষা করে অপরেশন করতে হবে। তাই এখানে তোমার স্বামীর চিকিৎসা হবে না। রায়গঞ্জে বড়ো হাসপাতালে নিয়ে যাও। কারণ সেখানে ভালো ব্যবস্থা আছে। তোমার স্বামী বেঁচে যাবে। শুধু তাই নয়, রায়গঞ্জের হাসপাতালে ডা. দত্ত আছেন। আমার কাছের মানুষ, তাকে আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব তোমার ভয় নেই।'' ডাক্তার বাবুর এই কথার উত্তরে গোধূলী জানায় যে, ''কত টাকা লাগবে ডাক্তার বাবু কারণ আমার তো এত টাকা নেই।'' তখন ডাক্তার বাবু গোধূলীকে আশ্বস্ত করে বলেন, ''হাসপাতালে অপারেশনের জন্য টাকা লাগবে না, এবং সরকারী সুবিধা যতটা পাও তার ব্যবস্থা আমি করব।'' কিন্তু গ্রামের এক

অভিজ্ঞ বৃদ্ধ মানুষ বলদেব বর্মনের কথা মতো গোধূলী তাঁর স্বামীকে তান্ত্রিক গুণিন সদানন্দের কাছে দেখায়। মোটকথা, গ্রামবাংলার সাধারণ গৃহবধূ হয়ে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে গোধূলী কুসংস্কারের বেড়া জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। গুণিন সদানন্দ গোধূলীর অভাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হরোকে বাঁচাবার ভরসা দিয়ে গোধূলীর কাছে পূজা দেওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছু লাগবে বলে একটি বড় ফর্দি-র তালিকা গোধূলীর কাছে তুলে ধরে। গুনিনের বেশ কিছু দাবীর নিরিখে গোধূলী তার অপরাগতার কথা জানালে সদানন্দ গোধূলীকে বলে তোমার এই ভিটার কাগজটা মোর কাছত বন্ধক রাখবা হবে, সুবিধা মতো টাকা শোধ করে খালাস করি নিবেন।

গোধূলী— কত টাকা দিবার হবে? ভিটাখান নি নিবেন? পারমো নি। ছাড়ি দাও মোক। সদানন্দের দাবীর নিরিখে গোধূলীর উত্তর থেকে এ জেলার গ্রাম্যীণ সমাজ ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক নিগূঢ় সত্য এখানে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। গোধুল টাকা দিতে না পারা সত্ত্বেও সদানন্দ হরোকে ছাড়েনি বরং তার উপর তান্ত্রিকতার অকথ্য অত্যাচারে হারোর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে তখন স্বামীর এই মরণাপন্ন অবস্থা দেখে গোধূলী ও তার ছেলে বিছানু ভীষণ ভেঙে পড়ে ও অসহায় বোধ করে। স্বামীর জীবন রক্ষার তাগিদে গোধূলী সমস্ত রকম ভয়ভীতি উপেক্ষা করে রাতের বেলায় নিখিল কর্মকারের অফিসে প্রবেশ করে দুই হাজার টাকা চেয়ে বসে। নিখিল কর্মকার টাকা দিতে সম্মত হলেও তেমনি গোধূলীকে জানায় যে কাজের বিনিময়ে এতগুলো টাকা শোধ করা সম্ভব নয়। এ কথার উত্তরে গোধূলী বলে— ভিটাখান বন্ধকি রাখি দিমো। তখন নিখিল কর্মকার সম্মতি জানিয়ে বলে— না। তোর আপদ-বিপদ তো আছে। মুই আছে সিঠাই কহছু। কেনে রাগ করিস। ড্রয়ার থেকে স্ট্যাম্প পেপার ও প্যাড বের করে) আয় ইঠে আয়। (নিবিড় ভাবে হাত ধরে টিপসই নেয়।) ব্যাস হয়ে গেল। আর কুনো চিন্তা নাই। এই হলো তুমার টাকা— (একতাড়া একশ টাকার নোট গুনে দু হাজার টাকা দেয়। গোধূলী সেটা নিয়ে বুকের ভিতর রাখে।) গোধূলী।

এরপর গোধূলী তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তার কাছে জল খেতে চাইলে নিখিল পাশের ঘরে যেতে বলে। গোধূলী পাশের ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই নিখিল ঘরে ঢুকে পড়ে গোধূলীর উপর শারীরিক নির্যাতন করে। এর ফলে গোধূলীর ফিরতে দেরি হওয়ায় স্বামী হরো এবং ছেলে বিছানু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমনকি এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় গ্রামবাসীরাও ব্যাকুল হয়ে হরোর বাড়িতে আসে। আসলে এতো রাতে মেয়েছেলে মানুষ গোধূলী না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে ভাবে যে গোধূলীর কোনো বিপদ হতে পারে। কিন্তু সর্বোপরি তাঁদের উদ্বিগ্ন মাথায়— একটি কথায় ঘুরফের করে সেটি হল নিখিল কর্মকারের স্বভাব চরিত্র ভালো নয় জন্য সবাই মিলে ঠিকাদারের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, এমন সময় গোধূলী টলতে টলতে প্রবেশ করে। এই

দৃশ্য দেখে হরো দুঃখে কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে— ''তুমরা মোক ছাড়ি দিলেন গোধূলী?''

গোধূলী (হরোর মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে ওঠে) ''নাই। ওইলা কথা ফির না কহেন। ওইলা হবার নি পারে।''

এই কথা বলে গোধূলী অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন হরো অতিকষ্টে উঠে বসে রাগে দুঃখে সে যায় পুত্র বিছানুকে আদেশ করে বলে— ''যা বিছানু, রাক্ষসটাকে বধ করিবা হবে। উয়ার এই গাওত আর থাকা চলবে নি।''

হরোর এই কথায় পুত্র বিছানু ও গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে ঠিকাদারের খুব প্রিয় ও কাজের লোক নিখিল কর্মকারের এই অত্যাচার তথা ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং রুখে দাঁড়ায়। নাটকটির শেষ পরিণতিতে নাট্যকার কালিয়াগঞ্জ তথা উত্তরদিনাজপুর জেলার সাধারণ গ্রাম্য মধ্যবিত্ত নিরীহ গরীব মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলি অভাবের তাড়নায় যন্ত্রণা বিদ্ধ হয়ে বর্তমান কৃষি অর্থনীতিতে সুরক্ষিত জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে বাধ্য হয়ে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দিনমজুরী তথা শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এমনকি তাদের ঘরের নারীদের (গোধূলী) আত্মমর্যাদা তথা মান-সম্ভ্রমও খোয়া যাচ্ছে— তার নিদারুণ করুণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের বিশেষ করে ভাবিত করে তুলেছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মূল গল্পের কাহিনি অবলম্বনে 'যতীন বাবুর চাকর' নাট্যরূপ (১৯৮৬ খ্রি:) দিয়েছেন সুব্রত রায়। ঊনবিংশ শতকের আশির দশকে উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে সামন্তপ্রভু তথা দেশীয় জোতদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে রায়গঞ্জ মহকুমার কুশমণ্ডি থানার সাধারণ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের দৈনন্দিন অভাব ক্লিষ্ট জীবনে জোদ্দারের অমানবিক শোষণ, এ জেলার রাজবংশী জনজীবনে মাটির গন্ধে গড়ে ওঠা তাদের নিজস্ব ঘরোয়া সংস্কৃতি খনগান বা খনপালা যা স্থানীয় জোতদার যতীনবাবুর বাড়িতে শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় কালীপূজাকে কেন্দ্র করে আনন্দ-উৎসবে আমোদের আয়োজন স্বরূপ উক্ত পালাগান বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সঙ্গে তাদের জীবনে ভণ্ডামী বা কুসংস্কারে আবদ্ধ জীবন কথার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের জনজীবন প্রকট আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সুনিপুনতার সঙ্গে নাট্যকার সুব্রত রায় এই 'যতীন বাবুর চাকর' নাটকে বেশ যত্নসহকারে তুলে ধরেছেন।

'যতীন বাবুর চাকর' নাটকের প্রারম্ভেই দেখা যায়, এই কুশমণ্ডি অঞ্চলের স্থানীয় জোতদার যতীন বাবুর ম্যানেজার সত্যবাবু খুব যত্ন সহকারে জোতদারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশুনা করেন এবং বিশেষ করে জোতদারের ১২৫-১৫০ বিঘা জমি জায়গায় চাষ-বাস ফসল ফলানো ও সেই কাজে যুক্ত চাকরদের ভীষণ কঠোরভাবে জোর-জুলুম সহ সুবিধা আদায় করে তার নিয়ন্ত্রণে

রাখার চেষ্টা করেন এবং সেই অসহায়তায় মানুষদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জোতদারের বলে বলিয়ান হয়ে আধিপত্য খাটিয়ে অতিরিক্ত মানবিক কায়িক শ্রম করিয়ে ফসল ফলান। এমনকি সেই সব শ্রমজীবী মানুষদের খোরাক বা আহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সংকুলান, জোতদারের বিশ্বস্ত ম্যানেজার সত্যবাবু সুদখোর মহাজনের কায়দায় শোষণ পরিলক্ষিত হয়, এই বেদনাদায়ক শোষণ প্রক্রিয়ার অতি বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বরূপ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উজ্জ্বল রূপে এই নাটকে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

ম্যানেজার সত্যবাবু যতীনবাবুর বৈঠকখানায় থেকে জোতদারের অধীনে কর্মরত চাকরদের উপর তদারকি করেন আবার কখন বাধ্য হয়ে মাঠে জমি জায়গায় নিজে গিয়ে দেখভাল করে চাকরদের কাজ কর্মের ভার দেওয়ার বিষয়ে কড়া আদেশ প্রদান করেন ও সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তাই এই নাটকের শুরুতে তিনি চাকর হারানকে বলেন— ''কি হইচে বেহুদ্দা কুঠিকার। পিঁয়াজবাড়ীটো সারা করি দি গেইচে আর তোমরা কচেন কি হইচে। জালা পিয়াজ গাছগুলান খাই একদম শ্যাস করি দিচে। শালা তোমরা শুধু খাবা আইচ্ছেন পেনঠি দিয়া মারি তোমার খাওয়া নিক্‌লি দিম।

হারান— মুই একটা মানষি কোন পাকে যাও কহেক দিনি?

সত্য — কেনেরে বেহুদ্দা, বেহানত যাই একবার পিয়াজবাড়ীটো দেখি আসিবা ফম থাকে না?

হারান— নিন্দ থাকি উঠিতো নিকশে ফেলিবা সময়ে পাওনা। প্রথমত গুরু বাইর করি বাহরত বাঁধি দিবা হছে— তারপর গোয়াল বাড়ি হছে— ঝাড়িবা গোয়ালত ফের কাড়ি কাটি দিবা হছে গোয়ালত খৈল দিবা হছে— ফের

সত্য— কাক্‌ খৈল দিবা হছে—

হারান— গরুক খৈল দিবা হছে—

সত্য — শালা—

হারান— তারপর ফের গোয়ালত—

সত্য — (ধমক) থাকেক বেহুদ্দা— বেহান থাকি শুধু গোয়ালত গোয়ালত করিবা ধইছে— ফটর ফটর কাথা শিখিচে—

ম্যানেজার তথা সরকার মশায় সত্যবাবুর সঙ্গে হারানের কথা-র্বাতা হওয়ার পর পরই লক্ষ করা যায় জোতদারের চাকর বলাই, ফটীক, কেষ্ট ও পুণ্য এরা কখনো গমের খেতে, কখনো আবার ধানের জমিতে হাল চাষ করার কাজে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করেও ম্যানেজারের মন খুশি করতে তারা ব্যর্থ হন। এই ঘটনার মাধ্যমে গ্রামবাংলার বুকে জমিদার-জোতদারদের অমানবিক উৎপীড়ন

ও শোষণ চক্রের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই প্রসঙ্গ ক্রমে দেখা যায় সত্যবাবু বলাই এর উদ্দেশ্যে বলেন— ''এ বলাই— বলাই বাহে এপাকে শুনেক তো—

বলাই : কেনে ডাকেছেন সরকার মশায়।

সত্য : কি বাহে বেহান থাকি পন্থা বেলা পর্য্যন্ত চারটা হালও এই কিনা জমি একচায উঠাবা পাল্লেন না।

বলাই : বলাই কি করিম। হামরা তো একটুও জিরাও নি।

সত্য : এ্যাইলা কাথা মোক কইস না মুই সবে জানু।

বলাই : তোমরা কহিবা পারেন।

সত্য : দেখ বাহে তুই যদি জনগুলাক খাটাবা না পারিস— তো বাপু পথ দেখেক— মালিকের অত মাঙ্গনা পাইসা নাহি।

বলাই : মুই তো জান বির করি দিয়া খাটোছো।

সত্য : মোর মুখের উপর টপর টপর করবু না— এই বেলার মধ্যে দু চাষ উঠাবা হবি— এইটা মুই কহি দিনু—

বলাই : এইটা হামার উপর জুলুম হয়া যাছে।

সত্য : কি কহুলু জুলুম— শালা— আই শোনেক— আরে বাপু তুই না হয় একেনা কমে খাটুলু সিটা মুই কবাও যাচোনা— দেখবাও যাচো না— কিন্তু জনগুলাক তো খাটাবু— কিরে বোঝা পালু- নে ধরেক ধরেক— যাও যাও পিটায় হাল চালা। ....''

বলাই-এর কথার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জেলা তথা গ্রামবাংলার উপর জোতদারদের অকথ্য অত্যাচারের কথা।

এমনকি সেই সময়কালে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিদিন কাজ করে সাধারণ মানুষদের দিন গুজরানের বা জীবন যাপনের কোন সু-ব্যবস্থা না থাকায় শুধুমাত্র পেটের দায়ে কিংবা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জোতদারদের বাড়িতে চাকরের পেশা করে জীবন অতিবাহিত করতেন। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে তাদের দু-বেলা পরিশ্রম মাফিক যথোপযুক্ত আহারও দেওয়া হত না। কাজের বিনিময়ে শ্রমিকদের কম খাবার দিয়ে অর্থাৎ অনৈতিক শোষণের মাধ্যমে জোতদারের সাশ্রয় ঠিক রাখার একটি আর্থ সামাজিক দৃশ্য আমরা এই নাটকে দেখতে পাব— ম্যানেজার সত্যবাবুর চাকরদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য থেকে। সত্যবাবু চাকর পুণ্যকে ডেকে বলে— 'পন্তা ভারটা ধরি এপাকে আয়তো—

পুণ্য : (কাছে এসে) কি কছেন?

সত্য : রাখেক— কি বাহে আজ ফের ১০টা পিয়াজ— গম বাড়িত কটা জন কাম করেছেন।

পুণ্য : ছয়জন।

সত্য : ছয়জন তো ছয়টা পিয়াজ নিবু— দশটা নিলু কেনে।

পুণ্য : ওমরা নিবার কছলো।

সত্য : শালা ওমরা মোর বোউটোক ধরি নি যাবা কহিলে তুই নিয়া যাবু— পিয়াজের দর কত জানিস্— তোমরা খাবা আইসচেন না কাম করিবা আইসচেন— চারখান পিয়াজ রাখি দিয়া যাও। (পুণ্য চলে যায়)। হু: শালা জমিদারি পায়া গেইচে।"

এই আবার এই নাটকের ২য় দৃশ্যে বলাই, ফটীক, কেষ্ট ও পুণ্যর কথোপকথনের মধ্যে উপরি উক্ত ঘটনার আর একটি করুণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পূণ্য : আই দাক্ষী, এই কিনা করি পন্তা তোক কায় আনিবা কইচে?

দাক্ষী : মোক কুনা কাথা কবেন নাই— মোক যা হুকুম কইচে— মুই তাই আনিচু।

ফটীক : কায় তোক হুকুম কইচে— কায়?

ফেস্টা : কায় ফের- সৈত্য দেওয়ানিটো ছাড়া ফের কায় হোবে।

ফটীক : এই কিনা করি পন্থা যাই মুই মাঝ বেলা পর্য্যন্ত হাল দিবা পারিম নাই।

বলাই : হমরা একখান প্যাঁজ বেশী খাইলে ওমার গায়ত লাগে— আর নিজের বেলা পৈতদিন দুধ খাছে-দুইখান করি মাছের ঠুমা দিয়া খোরাক খাছে—

কেষ্ট : ফের যতীনবাবুর পাইসা দি সুদ কামাছে— এইলা কাথা কায় কহিবে।

পুণ্য : হেই! এইকিনা শাক— দেখায় নি যায়— খাবারে মোনাছে না।"

উপরিউক্ত কথোপকথনের মধ্যে কেষ্ট চরিত্রের মুখে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় গ্রামের সাধারণ নিরীহ অসহায় গরীব মানুষদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমিদার-জোতদারদের অধীনে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরাও সুবিধা মতো বেকায়দায় ফেলে শোষণ করে থাকে। এই নাটকে নাট্যকার অনিল নামে এক গ্রামবাসী তার অভাবের দিনে যতীনবাবুর অনুগত ম্যানেজার সত্যবাবুর কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। কিন্তু সে কথামতো পরিশোধ করতে না পারার যে জ্বালা, সেই সুতীব্র শোষণ চক্রের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উঠে আসে। সে (সত্যবাবু) ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অনিলকে খবর দিয়ে ডেকে এনে ধমক দেয় ও শাসনের সুরে বলে— ''আ বাহে অনিল কহেক তো— কি করিবা চাহেছিস?

অনিল : মুই তো দিবার চাহা ছো।

সত্য : অ্যাইলা কাথা শুনা মোর ঢের হই গেইছে— ধার নিবার সময় চুক্তি করছুলু— অঘন মাসত টাকা সুদ সমেত সুজি দিবু— এইটা ফাগুন মাস— অঘান মাস থেকি তুই মোক ঘোরাছি।

অনিল : কি করিম কও সৈত্যবাবু— মুই তো চেষ্টা করছেও।

সত্য : অ-মোক তুই কি করিবা কহেছিত?

অনিল : তোমরা তো সবে বোঝা পাছেন— মোর দক্ষিণ পাথারের গামর ধানকোনা পোকা খাই একদম শ্যাষ করি দিচে।

সত্য : মাঘ মাসত কহলু— ফাগুন মাস পড়িলেই টাকা সুজি দিবু— তারপর তিন তিনটা হাট চলি গেলো— তোর দিবারে নাম নাই— বাড়ীত যাই নুকটেলেই তো বৌ কছে দেওয়ানিয়াটো বাড়িত নাই— তুই মোর থাকি পেলাই পেলাই বেরাবু নাকি বাহে—

এরপর পূণ্যের সঙ্গে কথা বলার পর সত্য পুনরায় বলেন— অনিল, বাহে, তাড়াতাড়ি করেক কি করিবা চাহেছিত— আজ ফের হাটবার— মোর অনেক কাম ছে।

অনিল : মুই আর কি কহিম?

সত্য : সোজা কাথা শুনি রাখ অনিল। মুই আর তোর পাছোত ঘুরিবা পারিম নাই— মোর সময়ের দাম ছ্যা— এই মাসের ভিতরত মোর টাকা চাই এইটা মুই কহি দিনু—

অনিল : মুই এ মাসত কেনং করি টাকা দিম— ঘরত এ কোনা খাবা নাই-মাউগ বেটীর পিন্দিবা কাপড় কিনিবা পারছো না—

সত্য : আরে বাহে দিবা ইচ্ছা থাকিলে দেওয়া যায়— কেনে তোর বড় বখরীটো বিকাইলেই তো টাকা উঠি আসিবে।

অনিল : ছেচায় কছো। ওইটা হামার নিজের বখরী না হায়— মানীর মাও আধী নিচে—

সত্য : শালা কান্দিবা ধইছে। শুনিরাখেক এই মাসের ভিতরত মোর টাকা না পাইলে— কি করি টাকা আদায় করিবা হয়— সিটা মুই জানু— তুই এখন বাড়িত যাই ভাবেক কি করুবু—

'যতীন বাবুর চাকর' নাটকের কাহিনীর পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যকার এই অঞ্চলের মাটির গন্ধে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি, যা ঘরোয়া সংস্কৃতির নিজস্বতায় পরিপূর্ণ এবং এই অঞ্চলের গরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাণের সংস্কৃতির সজীব ও প্রাণবন্ত ধারা খনগান বা খনপালা স্থানীয় জোতদার

যতীনবাবুর বাড়িতে শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় কালীপুজো উপলক্ষে গুরুদেব কালিকানন্দ মহারাজের সম্মুখে তার বিধান মাফিক তাকে খুশি করার উৎসবের আয়োজন স্বরূপ উপেন সাধুর দলের মাধ্যমে এতদ্ অঞ্চলে প্রিয় পালাগান— গুয়া কুণ্ঠি পালু, কাঞ্চাসোনার বরন তোমারও গুয়া ... পরিবেশিত হয় এবং গ্রামের দর্শকেরা মুগ্ধ হয়। এমনকি স্থানীয় জোতদারের কালীপুজোকে ভিত্তি করে এই সৌখিন সংস্কৃতি চর্চা এবং গুরুদেব কালিকানন্দে মহারাজ তার শিষ্য যতীনবাবুকে নানা ধরনের আপদ-বিপদের সমাধানের ইঙ্গিত প্রদান করেন। এই সব ভণ্ড গোঁসাইদের জোতদারদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। কারণ তারা সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন মানুষদের বিভিন্ন রকম দুর্বুদ্ধি দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার নানা রকম কৌশল বা অসৎ উপায়গুলি জানিয়ে দেয়। এবং নানারকম কুসংস্কারের বেড়াজালে সমাজকে আড়ষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে এই নাটকে কালিকানন্দ মহারাজ যতীনবাবুকে কিভাবে চললে তার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, কে তার ক্ষতির কারণ এবং কাকে নিয়ে তার চলা উচিত এই সংক্রান্ত পরামর্শের মধ্যে সে নাট্যকার সেই সময়কালের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একটি বাস্তব নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

এই নাটকের পরিণতিতে দেখা যায় কুশমণ্ডি থানার বাগঢোলের এক অভাবী নিরীহ গরীব মানুষ মনকটুর ছেলে পানু বাবার ১১/২ বিঘা জমি দেখাশুনা করতো আর কপিল মাস্টারের খন গানের দলে বাঁশী বাজিয়ে চলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে সে ধরনীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার মেয়ে পারুলকে বিয়ে করে ধরনীর জামাই হয়। কিন্তু বিয়ের দুই মাসের মধ্যে ধরনীর মেয়ে পারুল আবার অন্যএক মাটিকাটা ঠিকাদারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় ধরনী বাধ্য হয়ে পানুকে যতীন বাবুর ম্যানেজার সত্যবাবুর সঙ্গে কথা বলে দরমা ছাড়া শুধুমাত্র পেটভাতের বিনিময়ে কাজের ব্যবস্থা করে এবং তারপর থেকে পানু, জোতদার যতীনবাবুর অধীনে থেকে কাজকর্ম করে চলত। এই জোতদারের অধীনে থেকে কাজকর্ম করে সে ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত করছিল। এমতাবস্থায় একদিন সে বলাইকাকার কাছ থেকে তার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে এবং সে বাবার সেবা করতে না পারায় ভীষণভাবে শোকাহত হয়। এরপর সে বাড়িতে এসে দাদা কানুর সঙ্গে দেখা করে জানায় যে, বাবার শেষকৃত্যের আনুসঙ্গিক দায়িত্ব পালনের জন্য সে এসেছে। দাদা কানু ও বৌদি শান্তি তাকে সন্দেহ করে এই ভেবে যে, পানু বাবার সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছে। এমনকি তারা পানুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। দাদার এই আচরণে ব্যথিত হয়ে পানু বাধ্য হয়ে যতীনবাবুর বাড়িতে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে দুঃখের ভাব বিনিময় করে ও কায়িক পরিশ্রম করে দিন গুজরান করত। কিন্তু পানু যতীন বাবুর ঝি দাক্ষীর সঙ্গে গভীর রাতে দুঃখের কথা বিনিময় করতে থাকে এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতার

ভাব সৃষ্টি হয় এমন সময় তারা দেখতে পায় জোতদার যতীনবাবু নতুন এক লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে তার সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। এবং তারা আড়াল থেকে উভয়ের কথাবার্তা শুনতে পায়। যতীনবাবু নতুন লোক দীনুকে বলছে তোর এত ডর কেনে বাহে? অ্যা: তোর এত ডর কেনে?

দীনু : বাবু দর পাছো ওই নয়া দারোগাটোর তনে— অয় শালা মোর পাছ ছাড়বার নি চাহে—

যতীন : সিটা ঠিকে— ভয় এনা আছে শালা চারটা মাডার কেস তোর নামে ঝোলেছে— ছাড়বার নি চাহে— তবে মোরো নাম যতীন মণ্ডল— মুইও জানু কেনং করি ওমাক ফান্দোত ফেলবা হয়।

দীনু : শালা নয়া দারোগাটো খুবে চুথিয়া।

যতীন : দীনু তুই মোর থাকিয়া দরমার চাকর— আর অমরা হইল মোর ...

দীনু : সিটা মুই জানু—

যতীন : শুনি রাখেক বেশি কাথা কওয়া মোর একদম পসন নি লাগে— মুই চাহু কাম। এইটা ফম থুইস।

দীনু : ঠিক ছে।

যতীন : দীনু

দীনু : কহেন—

যতীন : তুই মোর ঠিকা কি চাইস?

দীনু : পুলিশের হাত থাকি বাঁচিবা তনে তোমার আশ্রয়— আর...

যতীন : টাকা— না হয়। মুই কি চাও?

দীনু : বাগডোল মৌজার তামান জমিলার দখল।

যতীন : ঠিকে, বাগডোল মৌজার জমিলার পর মোর খুব লোভ বাহে— তা দখল করিবা তাগদ ছ্যা তো—

দীনু : এইটা ফের কি কছেন— মোর তাগদ-ই থানার তামাল্লা মানষি জানে—

যতীন : যতীন মণ্ডল মানষি চিনে কাম দিয়া— নাম দিয়া না হয়।

দীনু : বাবু তোমরা মিছায় ভাবেছেন— ঠাকুরটো মোক তামাল্লা বাতে দি গেইসে—

যতীন : তাইলে তো বোঝায় পাসিত! বাগডোলের জমিলা তাড়াতাড়ি দখল না মোর ঠিনা লাঠুয়ার দাম লিছে— এইটা জানা আছে তো। তবে তুই মোর ঠাকুরের নোক— ঠাকুরের মান রাখিবা চেষ্টা করুবু।

দীনু : জরুর চেষ্টা করিম।

যতীন : হ্যাঁ এইটা ফম থুইস্। চলেক সরত যাবা হোবে।

দীনু : চলো—

যতীন : কালফের কামটো ফম ছেতো—

দীনু : ফম ছ্যা...”

মোটকথা, এই যতীনবাবুর চাকর, নাটকে যতীনবাবুর সঙ্গে এই নতুন লাঠিয়াল কাজের লোকটির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কুশমণ্ডি থানার বাগডোল অঞ্চলে জোতদার যতীনবাবুর জোর পূর্বক জমি দখলের একটি বাস্তব আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। আবার জমিদারের বাড়িতে কর্মরত চাকরদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা থেকে সেই সময়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক কষ্টের এক নিদারুণ চিত্র আমাদের পীড়াদায়ক করে তোলে। যতীন বাবুর বাড়িতে সকাল বেলা চাকর বলাই, পুণ্য ও কেষ্ট-র মধ্যে আলোচনা চলছে। তখন বলাই কেষ্টকে বলে— ‘‘কেষ্ট মোক আজ শ্যাষ বেলায় এনা বাড়ীত যাবা হোবে।

কেষ্ট : কেনে কাকা—

বলাই : তোর কাকীর প্যাটের বিষটা ফের বাড়ী গেইছে।

পুণ্য : কাকা তোমরাও পারেন— কেনে আয়গঞ্জ ধরি নি যাবা পাচ্ছেন না— অন্না বড় বড় ডাক্তার ছ্যা—

বলাই : পুণ্য তুই মোক ভালোয় সমাধান বাতালু আরে বড় বড় ডাক্তার বড় বড় মানষির তনে— হামার তনে না হয়।

কেষ্ট : কতদিন হয়া গেলো কাকীটো ভোগেছে—

পুণ্য : কাকা তুই কাকীটোক কোনও ঔষদে খিলাছি না?

বলাই : ওই হামার জটাই মাহাত্ টো দেখেছে— উ মাসে ফের ঝাড়ি জলপড়া দিয়া গেলো—

পুণ্য : জলপড়া খাই কি প্যাটের বিষ যাইবে—

বলাই : তা কি করিবু কহেক— মোর কামের উপর বুঝুলু চারটা প্যাট চলেছে— ইয়ারপর ফের মাহাত্টোক পাইসা দিবা হচে। মুই আর পারছো না রে পুণ্য।

কেষ্ট : অত ভাববার নি হোবে। মাহাত্টোর বেমায় ক্ষেমতা— অয় পারিবেই।”

এই নাটকের কাহিনির পরিসমাপ্তিতে এসে আমরা দেখতে পাই যে, দীনু লাঠুয়া পানুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে লেগে থেকে পানুকে শাসায় এই বলে যে, তার বাগডোলের জমির অংশ দাদার

কানুর নামে লিখে দিতে। কিন্তু পানু রাজী না হওয়ায় তাকে ধমক দিয়ে সে বলে যে ৭ দিনের মধ্যে দাদার নামে জমি লিখে দিতে হবে। এরপর পানুর দাদা কানু তার কাছে এলে জানা যায় যে, এই দীনু লাঠুয়ার কাছ থেকে গত ধনকলের মেলাত, জুয়া খেলা বাবদ পাঁচ কুড়ি টাকা কানু ধার নিয়েছিল তার জন্য এই দীনু লাঠুয়া জোর করে পরিশোধ বাবদ ঠকিয়ে তাদের জমিটা নিজের নামে লিখে নিতে চায়। তখন দুই ভাই বুদ্ধি করে বাবার জমি বাঁচানোর তাগিদে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, জমি সস্তায় বা সামান্য মূল্যে কাউকে না দিয়ে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দুই ভাই সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। কিন্তু দীনু লাঠুয়ার এই চক্রান্তের আড়ালে জোদ্দার যতীনবাবুর জমির প্রতি লোভের বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যখন ম্যানেজার সত্যবাবুর চাকরদের সামনে পানুর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য উৎসাহ ভরে প্রশ্ন করে—

সত্য : গোটা বাগডোল মৌজা ধরি ধোকরা কারখানা হোবে— বড় বড় বাড়ী হোবে— বিলাত থাকি যন্ত্র আসিবে— বুঝুলু পানিশালা হাটতক পাকা আস্তা হোবে—

বলাই : ছেচায় কছেন সরকার মশায়—

সত্য : মিছায় কাথা মুই কও না— মোর নাম সত্য। তা পানু বাহে দেড়ু বিঘাত ক কাটা জমি হয় জানিস?

পানু : জানু—

সত্য : এক কাটায় দাম সরকার দিবে ৫০০ টাকা— তাহলে হিসাব করেক কেত টাকা হোবে—

পানু : ছেচায় কমেন সরকার মশায়?

সত্য : ছেচায়—ছেচায়— ইবার বোঝা পাসু কেনে দীনু লাঠুয়া তোর পাছোত নাগিছে— যতীন বাবু এমনা এমনি চারশো টাকা দরমা দেছে না— যতীনবাবু প্রতিদিন দীনু লাঠুয়া আর টাকার ঝলা নি বাগঢোলত যাই পড়ি থাকোছে—

যাউক মোর কোন চিন্তা নাই— তা পাসু বাহে তুই বাঁচবা পাড়বুনা তোক নিখি দিবায় হোবে—

এ্যাই বলাই বাহে তোমরা বসিনা থাকি কাম ধরো কাম ধরো মুই যাছো— (সত্য চলে যায়)

পানু : তার মানে ইটা যতীন বাবুর কাম তাইলে

ফটিক : বগধা কুণ্ঠিকার— এইটা বোঝা পাইস না—

বলাই : সামনের পাকোত দীনু লাঠুয়া পাছোত যতীনবাবু—

পুণ্য : এমার এত্তো লোভ?

কেষ্ট : এইটা তুই পেত্থম বুঝুলু নাকি?

পুণ্য : না মুই কছো— ওমার তো ঢেইল্লা টাকা ছে— পানুর কিছু টাকা হইলে ওমার কি ক্ষতি হইল— তাও ফের ওমার টাকা না হয়—

বলাই : পানুর টাকা হইলে পানু ফের অমার বাড়ীত কাম করিবে— কহেক তো—

ফটীক : কেনে ফের কাম করিবে— তখন ফের পানুর কিসের অভাব?

বলাই : আই! অমার এমন টাকার নিশা ধরি গেইছে— যতীন বাবুর পসন হইবে?

কেষ্ট : হ্যাঁ পানু— তুই লিখি দিবু নি তো— দেখা যাউক কি করেছে?

অর্থাৎ কিনা পানু জোতদার বাড়ীর সকল শ্রমজীবী চাকরদের পারস্পরিক সাহচর্যে ও পরামর্শে সাহসী ও শক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় দেয়। সে মনের দিক থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাপের জমি মাংনায় (সস্তায়) লাঠিয়াল দীনুর মারের ভয়ে দিতে নারাজ। অপর দিকে জোতদারের আদেশে লাঠিয়াল দীনু পানুর উপর অমানবিক মানসিক চাপ, শাসানি ও ধমক দিতে থাকে। পরিশেষে একদিন দীনু পানুর উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু করে, কিন্তু পরক্ষণেই পানু দীনুর গলা চেপে ধরে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এবং দীনু আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারে না। এমনকি অন্যান্য চাকরদের সকলের নিষেধ করা সত্ত্বেও পানু ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত দীনু লাঠিয়াল মারা যায়। খবর জোতদার বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ামাত্র যতীনবাবু ম্যানেজার সত্যকে নিয়ে পানুর কাছে এসে পানুকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সত্য উৎঘাটনের চেষ্টা করে এবং দীনুর মৃত্যুতে তার পরাজয় মেনে নিয়েও পানুকে কঠোর শাস্তির মুখে ঠেলে দিয়ে নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার কৌশলগত প্রয়াস চালিয়ে যান। এইরকম অবস্থায় তিনি পানুকে বলেন— ''দেখা যাউক কি করা যায়— হাজার হউক তুই মোর চাকর— (তোষামদ) তা আপদ আছে বাহে তোর— মুই তো একেবারে তাক্ মারি গেছু— দেখি বোঝায় নি যায়— মোর ঠাকুর কছোলো দীনু মোর রক্ষাকবচ অয় মোক যমের হাত থাকি বাঁচাইবে। তা বাহে পানু তুইতো যমেরও বাপ— মোর রক্ষাকবচ একেবারে ছিঁড়ি ফেলালু—

এই কথা বলার পর যতীনবাবু পানুর শাস্তির ব্যবস্থা করে সত্যকে জানান দীনুটার তনে পানুটার সাহস বাড়ী গেইলে শালার ডানা গাজিহাই— সত্য উয়াক শালা পিঞ্জরীত ভরবা হোবে—"

যতীনবাবুর কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, পরিশেষে পানুর জেল হয়। তার বাবার জমি বাঁচাতে গিয়ে পরিণামে দেখা যায় তার জমিসহ জীবনও মাটি হয়ে যায়। নাট্যকার এই নাটকে এই জেলায় তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের বুক চিড়ে সাধারণ কৃষকদের উপর সামন্ত প্রভু তথা জোতদারদের দৌরাত্ম্যের এক ভয়াবহ করুণ শোষণের এক জীবন্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নজির

বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সৃষ্ট নাটকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

আমরা জানি নাটক সমাজের দর্পণ। নাটক ও নাট্যপ্রযোজনা আমাদের সমাজকে শিল্পসম্মতভাবে পরিস্ফুটিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব পালন করে। তাই সার্থক নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে আমরা মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রার ছবি, তাদের হাসি-কান্না, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, সন্তোষ-বিক্ষোভ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং স্বপ্ন-সংগ্রামের বিশ্বস্ত চিত্র উপলব্ধি করি। সুতরাং এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে মানুষ নাটক দেখে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানকে বুঝতে পারে, তখনই উন্নত জীবন ও সমাজ গঠনের প্রেরণা পায় এবং স্বপ্ন পূরণের বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধসহ সংগ্রাম গড়ে তোলে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে যখন মানুষ নথিভুক্ত হয় ঠিক সেই সময় থেকেই শ্রেণি বিভক্ত এবং শোষিত ও নির্যাতিত। তাই এমনকি সমাজ ব্যবস্থার বৃহত্তর পরিধিতে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তীব্র বৈষম্য শুরু হল এবং সেই পথ বেয়েই অনুপ্রবেশ করলো ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বাধীনতাহরণ। মোটকথা নাটকে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের (Standared of living) যে সক্রিয় প্রচেষ্টা ও চাহিদা লক্ষ করা যায়, সেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব নিদর্শন পশ্চিমদিনাজপুর জেলার (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) নাটকেও পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মন্মথ রায় এই জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে যথার্থ মন্তব্য করে বলেছেন— ''পশ্চিম দিনাজপুরের জনজীবনটাও নাটক। ঐতিহাসিক কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের পীঠস্থান এই দিনাজপুর অঞ্চলেই। কৃষক বিদ্রোহের অঙ্গরূপে 'তে-ভাগা' আন্দোলনের জন্ম এই দিনাজপুর জেলায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে দিনাজপুরের অবদান অসামান্য। দুঃসাহসী সংগ্রামী এই জেলার অধিবাসী। শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, এক মর্মন্তুদ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল এই জেলার অধিবাসী। প্রচণ্ডতম এক উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানও হয়েছে এই জেলায়। পাকিস্তানের আক্রমণেও মনোবল হারায়নি এখানকার জনসাধারণ। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে তারা। দিনাজপুর জেলার ইতিহাসটাই নাটক।"[৬] প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চে ব্রিটিশ সরকারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৮৭৬ খ্রি:) প্রভাবজনিত কারণে শুধুমাত্র পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের মঞ্চায়ন প্রাধান্য লাভ করে। তুলনায় অন্য শ্রেণীর নাটকের মঞ্চায়ন হয়নি। সমাজ-মানসিকতার এই প্রতিবন্ধকতার দরুণ জেলার বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে প্রতিবাদী চেতনার তথা দেশাত্মবোধক কোন নাটক উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক নাটকও মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ থেকে এখানে বঞ্চিত হয়। এখানে প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা শহর বালুরঘাট ছিল উত্তরবঙ্গের নাট্যতীর্থ। বালুরঘাটের ভূমিজ সন্তান, নাট্যকার মন্মথ রায় কলকাতার স্কটিচ চার্চ কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় তার নিজস্ব উদ্যোগে বালুরঘাটে 'ভেকশন ক্লাব' স্থাপন করে তিনি ছাত্রাবস্থায় বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় কাহিনীকে ভিত্তি করে রচনা করেন 'বঙ্গে মুসলমান' (১৯২০) নামে পূর্ণাঙ্গ প্রথম নাটক এবং ভেকেশন ক্লাবের প্রযোজনায় ও তাঁর নিজস্ব পরিচালনায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি বালুরঘাটের এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাবের মাঠে। বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে অভিনীত হয়। তার এই নাটকটিতে লক্ষ করা যায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের উত্তরপশ্চিমে গঙ্গারামপুর গ্রামের পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম অংশে নারায়ণপুর গ্রামে বক্তিয়ার খিলজীর সমাধি অবস্থিত। উক্ত সমাধির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নাট্যকার এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি রচনা করতে গিয়ে তৎকালীন সময়ের গঙ্গারামপুরের পার্শ্বস্থ অঞ্চলের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার কিছুটা নিদর্শন সাধ্যমতো তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। তাঁর পরবর্তী 'অমৃত অতীত' (১৯৫৯) নাটকে পালবংশীয় রাজা গোপালের অভ্যুদয়— এই কাহিনীর প্রেক্ষাপটে কৈবর্ত বিদ্রোহের রূপকের আড়ালে এই অঞ্চলের তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য কোন নাটকের স্থানীয় সমস্যার আলেখ্যে কোন নাটক রচিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বালুরঘাটের নাট্যব্যক্তিত্ব অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর একটি মূল্যবান মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য— ''মন্মথ রায়ই প্রথম যিনি বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়কে বিষয় করে 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটি (পঞ্চাঙ্ক) রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির অভিনয় সারা রাতেও শেষ হয়নি। তখন তিনি 'মুক্তির ডাক' নামে একটি একাঙ্কিকা রচনা করেন— যা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বাংলার অরাজক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বখতিয়ারের বাংলা জয়—এই বিষয় নিয়ে তাঁর 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটি রচনার উদ্দেশ্যেই ঐ সময়ে গঙ্গারামপুর ও সন্নিহিত এলাকা'র রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরা। ... পরবর্তীতে মন্মথ রায়ের 'অমৃত অতীত', নাটকে পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের অভ্যুদয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর কয়েকটি নাটকে কোন কোন জায়গায় এখানকার কথা বলার চেষ্টাও তিনি করেছেন। তবে এ অঞ্চলের তথ্য তুলে ধরাটা সেখানে গৌণ।''[৭] এছাড়াও জেলার শ্রেষ্ঠ নট নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর তাঁর রচিত 'প্রতিষ্ঠা' (১৯২১) নাটকে কৈবর্ত শক্তির উপর ক্ষাত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ রাজ্যচ্যুত পালরাজ দ্বিতীয় মহীপাল দেবের ভাই রামপাল দেব সামন্ত রাজাদের সাহায্যে কৈবর্ত্যের হাত থেকে হৃত রাজ্য উদ্ধার করে— এই কাহিনির পেক্ষাপটে এতদ অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যার আলেখ্যে নাট্যমুহূর্ত তৈরি হয়।

আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি যে, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে দিনাজপুর অঞ্চল ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে আসে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের আমলে এই অঞ্চলের স্থায়ী প্রশাসনিক অবয়ব বা সুস্পষ্ট রূপ (১৮৭৬) তৈরি হওয়ায় এই সময় থেকেই দিনাজপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চিত্রের বাস্তবসম্মত রূপ আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সেই কারণে বলা যায় যে, এ জেলার শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায় ও শিবপ্রসাদ করের উক্ত নাটকগুলিতে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলা তথা দিনাজপুর জেলার উপর পাল আমলে কৈবর্ত বিদ্রোহ ও বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটলেও তৎকালীন দিনাজপুর জেলার পাঠক আয়তন স্থিরীকৃত না হওয়ার সুবাদে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বুঝে ওঠা সম্ভবপর নয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে নাট্যমঞ্চে ষাটের দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটার ফর্মের মঞ্চায়ন প্রক্রিয়ার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু দল গঠিত হয়েছিল। যথা— তরুণতীর্থ, ত্রিশূল, কচিকলা এ্যাকাডেমী, প্রাচ্যভারতী নাট্যনিকেতন ইত্যাদি। এই নাট্যদলগুলি অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাটক মঞ্চস্থ করেছে। সত্তরের দশকে পশ্চিম বাংলার নাট্যজগতে গণনাট্য থেকে নবনাট্য— এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর গ্রুপ থিয়েটার স্থায়ী আসন অর্জন করে। এই সময়কালীন মুহূর্তে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আরও কয়েকটি নতুন দল গ্রুপ থিয়েটারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যচর্চার কাজ শুরু করে। এই সংস্থাগুলির হাত ধরে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় তথা জেলার নিজস্ব সমস্যাকেন্দ্রিক ঘটনার নাট্যপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে ত্রিতীর্থ (১৯৬৩ খ্রি:) হল বালুরঘাটের অন্যতম ও বলিষ্ঠ গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা প্রযোজিত নাটক প্রযোজনার মধ্যে 'জল', 'দেবীগর্জন', 'দেবাংশী', 'ছেঁড়াতার', 'মন্ত্রশক্তি', 'গ্যালিলেও', 'ভাঙ্গাপট', 'তিনবিজ্ঞানী', 'অনিকেত' প্রভৃতি সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ রাজধানী কলকাতায় বহু প্রশংশিত হয় ও দর্শক সমাজে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা তাঁর রজত-জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা পল্লবিত পঁচিশ বছর স্মরণিকা সংখ্যার প্রস্তাবনায় জানিয়েছে— ''আমরা মনে করি নাটক শুধু বিনোদন নয়। আরও বেশি কিছু। যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে আমরা বাস করি তার সমস্যা, দ্বন্দ্ব, নাটকের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া একান্ত জরুরী। নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা ধরবার চেষ্টা করে থাকি। রাজধানী কেন্দ্রিক সংস্কৃতি বিকাশের যে ধারা অব্যাহত আমরা তার বিরোধীতা করি এবং সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রী করণের প্রচেষ্টায় আমরা নিয়োজিত। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরী।''[৮]

উক্ত মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় যে, ত্রিতীর্থ তাঁদের এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়ন করার তাগিদে ত্রিতীর্থর প্রাণপুরুষ ও জেলা তথা বাংলার খ্যাতনামা নট-নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাটকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল বিশেষ করে দেবাংশী, মন্ত্রশক্তি নাটকে। এছাড়াও আরও কিছু নাটকেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিদর্শন বিধৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'দেবাংশী ও মন্ত্রশক্তি' নাট্য-প্রযোজনা দুটি উত্তরবঙ্গের সমাজ- মানসিকতার পটভূমিকায় লেখা এবং মঞ্চাভিনীত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই নাটক দুটি সমাজ-অন্দোলনের বাঁধনে আবেদন মুখী হয়ে উঠেছে। এমনকি এই নাট্য-প্রযোজনা দুটি উত্তরবঙ্গের মৌলিক ভাবনায় রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি।

'দেবাংশী' অভিজিৎ সেনের গল্প অবলম্বনে জেলা তথা বাংলার স্বনামধন্য নট-নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ। এই নাটকটি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আঞ্চলিক কথ্যভাষায় পশ্চিম দিনাজপুরের লোকজীবনের ধর্ম এবং সামাজিক রিচ্যুয়ালের পরিকাঠামোয় রচিত হওয়ার সুবাদে স্বাভাবিকভাবে 'দেবাংশী' নাটকে সেই সময়ের জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সাবলীল ভাবে ফুটে উঠেছে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমা সংলগ্ন খাঁপুরে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। এই নাটকটিতে উত্তরবঙ্গের সমাজ আন্দোলনের প্রেক্ষিত স্থান নির্দেশিত করা হয়েছে এবং এই সমাজ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তবসম্মত স্বরূপ ও জীবন্ত নিদর্শন এই নাটকে প্ররিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এবং হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত 'খারিজ' নাটকেও দেখা যায় এ জেলার একটি গ্রামের অসহায় গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গ্রামীণ অর্থপিশাচ সুদখোর মহাজন বনমালী তার সুদখোর-বৃত্তির চক্রজালের মাধ্যমে শোষণ করে জমি-জায়গা, সোনাদানা, ঘটি-বাটি প্রভৃতি আত্মসাৎ করে তাদের নিঃস্ব করে তোলে। পরিশেষে বনমালীর কৃষি মজুর নগেন এই সব গরীব মানুষের ধনসম্পদ কৌশলে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের আর্থিক সুরক্ষিত জীবনে পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে জেলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট এই নাটকে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার সঙ্গে সঙ্গে বালুরঘাটের তূণীর গ্রুপ থিয়েটার সংস্থাও বর্তমানে তাদের নাট্য-প্রয়াস করে চলেছেন। তূণীর প্রযোজিত এবং এই সংস্থার নট-নাট্যকার জিষ্ণু নিয়োগীর রচিত 'জলপোপ' নাটকে পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা অভিবাসী হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের খিদিরপুর অঞ্চলে আত্রেয়ী নদীর তীরে এসে বসবাস করেন। মাছ সংগ্রহ করে সারাবছর জীবন ধারণ করতেন কিন্তু আত্রেয়ীর জলের নাব্যতা হারিয়ে জলসংকট ও মাছের অভাব হওয়ার সুবাদে জীবিকার সন্ধানে বাধ্য হয়ে তারা অন্য পেশায় ধাবিত

হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর একটি বাস্তব চিত্র এ-নাটকে বিধৃত হয়েছে।

গল্পকার অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পের মূলকাহিনী অবলম্বনে দেবাংশী নাট্যরূপ দিয়েছেন ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার কর্ণধার এবং জেলা তথা বাংলার স্বনামধন্য নট-নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। দেবাংশী ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ই নভেম্বর তাঁর নির্দেশনায় এবং ত্রিতীর্থের প্রযোজনায় গোবিন্দ অঙ্গনে প্রথম অভিনীত হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অধীনভুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন কিছু প্রথা, সংস্কার এবং লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ও পূজার থান নিয়ে মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের অলৌকিক বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বাঁচে ও বেড়ে ওঠে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মা বিষহরি মায়ের মাহাত্ম্য ভরা চৌহদ্দির মধ্যে খেরা খেলার থান, ভর ওঠা এবং গুণীনদের উপর এতদ অঞ্চলের মানুষেরা অগাধ বিশ্বাস রাখতেন, দেবাংশী-র কাহিনীর শুরুতেই এই সব প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, জরা-ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা, অসুখ-বিসুখ ও নানা চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি জীবন যন্ত্রণার নিরসন এইসব থানে দৈবের নির্দেশ অনুসারে বহমান। তাই দেখা যায়, বিশেষ দিনগুলিতে— এই সব থানে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। এ যেন এক মহামিলন মেলা। দেবাংশী নাটকের ১ম দৃশ্যে যে দুজন গুণমানের (গুণীন) মধ্যে লড়াই চলে মন্ত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার তাগিদে, আমরা দেখি তাদের মধ্যে একজন মুসলমান সামসের গুণমান ও অন্যজন হিন্দু বিরাম গুণমানের মধ্যে মন্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এবং উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দুটো দল হয়ে যায়। সেখানে কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান ধর্মীয় ভাগাভাগি নেই। সত্যিকারের এক মিলন স্থান হয়ে ওঠে এই ঘেরা থান। গ্রাম্য জীবনে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে পাশাপাশি বাস করা এ যেন এক মহৎ গ্রামীণ ঐতিহ্য। দেবাংশী নাটকে এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় একজন মানুষ সাধারণ গ্রামীণ সমাজে সকলের লোকবিশ্বাসে দেবতা হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ এই নাটকে সারবান লোহার অত্যন্ত অল্প বয়সে (১০ বছর) হঠাৎ খেরা খেলার চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তার গুরু বিরাম গুণমান সেই বালকের ভাবলক্ষণ দেখে ঘোষণা করে যে, সারবান লোহার দেবতার অংশ। সে মানুষের নৈমিত্তিক সুখ-দুঃখ থেকে শুরু করে নানারকম চাওয়া পাওয়া, আর্জির সমাধান এবং সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে নিদান দিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সারবান লোহার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে (চল্লিশ বছর বয়সে) প্রথম অনুভব করে যে, খেরা থানে বসে সে যে নিদান দেয় তাতে ভেঙ্গে পড়া মানুষের আত্মশক্তি এবং মনের জোর বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর অর্থবান মানুষ এগুলোকে কুসংস্কার বুজরুকি বলে চিহ্নিত করে। দক্ষিণ দিনাজপুর মূলতঃ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাট, যোগাযোগ,

চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ছিল অপ্রতুল। ফলে গ্রামের নিস্তরঙ্গ জন-জীবনে সারবান-লোহারের মতো দেবাংশী বা কোন দেবতার ভর ওঠে এমন কোন মানুষের কাছেই তাদের দৈনন্দিন সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিয়ে যেতেন এবং দেবাংশীর আদেশ-নির্দেশ অনুসারে তারা সিদ্ধান্ত নিতেন। এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, দেবাংশী এক সাংবাদিককে নিজে বলেন যে, আমার এই কাজগুলি গ্রামের মানুষের বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে। এই কথা বলে তিনি সুখন মণ্ডলের বোবা কালা ছেলেকে সেই সাংবাদিকের সামনে মা বিষহরির থানের ফুল ও মাটি তাবিজ করে ছেলের গলায় পড়ানোর এবং প্রসাদ খাওয়ানোর আদেশ দেন। তখন সাংবাদিক প্রশ্ন করে যে, শুধু মাদুলী ঝুলিয়ে আর প্রসাদ খেয়ে সেই ছেলেটির মুখে কথা ফুটবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সারবান লোহার (দেবাংশী) সাংবাদিককে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করেন? ডাক্তার দেখালে সব মানুষ কি ভালো হয়? আমি জানি বিষহরির কৃপা হলে হয়তো ছেলেটার মুখে কথা ফুটবে অথবা ফুটবে না। আরও বলেন আপনাদের শহরে ডাক্তার, বদ্যি, উকিল, মোক্তার, মরুব্বি ও এম.এল.এ আছে। আপনারা বিপদে পড়লে তাদের কাছে যান এবং আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামের মানুষের কি আছে? বিষহরি, চামুণ্ডা মনসা, কালী এই সব দেবীরাই গ্রামের মানুষের কাছে দৈনন্দিন নিদারুণ অভাব ও দৈন্যদশা থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ ডাক্তার, বদ্যি, উকিল, মোক্তার, এম. এল.এ. সব। আসল কথা হল দেবাংশী জানে যে, গ্রামীণ সমাজের হেরে যাওয়া মানুষের মনের জোরটাকে বাড়িয়ে দিলে তারা যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে স্বাভাবিক ছন্দে বাঁচতে পারে, এই নাটকে নাট্যকার সেই বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থার জীবন্ত দৃষ্টান্ত পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন।

এই নাটকের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কৃষিজীবি মানুষের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ ধরা পড়েছে। এই গ্রামীণ সমাজের কৃষিজীবী মানুষদের নানান রকমভাবে শোষণ প্রক্রিয়া চালায় জোতদার এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষেরা। যার জমি বেশী তার উৎপাদিত ফসলও বেশী এবং সে ধনবান এই চিরায়ত ধারণা প্রতিটি গ্রামে এখনও বিদ্যমান। এ নাটকে দেবেন মণ্ডল জোতদার এবং ধনবান তার বাড়িতে অনুমোদন প্রাপ্ত বন্দুক আছে। দেবেন মণ্ডলের একজন কৌশল্যা নামে রক্ষিতাও আছে এবং সে জোতদার দেবেনের কাছে জমি পাওয়ার জন্য আবদার করে। দেবেন মণ্ডল সেতু বর্মনের জমি গ্রাস করতে চায়। জানা যায় সেতু বর্মন তার মেয়ের বিয়ের সময় ছ'বিঘা জমির ফেরত কবলা বাবদ ছ'শ টাকা ধার নিয়েছিল। গরীব সেতু বর্মন সে ধারের টাকা পরিশোধ করতে চায়ে কিন্তু দেবেন মণ্ডল ফেরত কবলা ফেরত দিতে চায় না বরং সেতুর জমি সে দখল নিতে চায়। এভাবে গরীব চাষীর জমি বেহাত হয়ে গেলে সে অর্থনৈতিক সংকটের পড়ে। সেই সংকট থেকে বের হতে গেলে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি করবার মতো অর্থনৈতিক ক্ষমতা সেতু বর্মনের নেই। ফলে প্রতিটি

গ্রামাঞ্চলে দেবতার থানে এই সব সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সাধারণ অসহায় গরীব মানুষেরা আর্জি জানায়, বিচার চায় এবং পরিশেষে হইত্যা দেয়। পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে সৃষ্ট এই সব দেবতাদের থানের মাহাত্ম্য এক সময় দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। 'দেবাংশী' নাটকে সেই মাহাত্ম্যের বাস্তবসম্মত উজ্জ্বল ছবি আমরা দেখতে পাই। তাই দেবাংশী নাটকে দেখা যায় সেতু বর্মণের ঋণ খেলাপী জমিটা দখল করতে চায় জোতদার দেবেন মণ্ডল। আর সেতু এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় দেবাংশীর কাছে নিদান চেয়ে বলে— ''মাও ! মুই বিচার চাও। গরীবের প্যাটত হাত দিছে দেবেন মণ্ডল। তিন বছর আগে, মিয়ার বিয়ার সন মণ্ডলের কাছে ছ'বিখা জমিন ফেরত কবলা করে ছ'শ টাকা ধার নিছনু। এখন মুই ধার সুধবা চাই, কিন্তুক মণ্ডল কবলা ফেরৎ দিবার চাহে না, তুমি বিচার করেন মাও। মোক কয়া দেন মাও মুই এখন কি করমো ?"

দেবাংশী জানে এ নিদান দেওয়া তার পক্ষে কোনমতে সম্ভব নয়। আবার সে এও জানে যে গ্রামের সবাই বিশ্বাস করে যে, মা বিষহরি দেবাংশীর মুখে কথা ফোটায়। তাই কেউ আর্জি জানালে দেবাংশী তাকে ফেরাতে পারে না। বাধ্য হয়ে তাকে সেই আজির উত্তর দিতে হয়। তাই প্রসঙ্গক্রমে দেবাংশী ও তার স্ত্রী মোক্ষদার মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেতু বর্মনের দেবাংশীর কাছে নিদান চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেবাংশী শেষ পর্যন্ত যে উত্তর প্রদান করেছিল তার মর্মার্থ তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে বিধৃত হয়ে উঠেছে। স্ত্রী মোক্ষদা কথা প্রসঙ্গে দেবাংশীকে বলে— ''তুমি হলেন দেবাংশী-তুমি মানুষক ভয় পান। সারবান সারবান—দেবতার কোপ মানুষের উপর পড়ে। মানুষ দিশাও হারায়। ফির দেবতার কাছে আর্জি জানায়, দেবতা কিরপা কইরলে ভাল নাত্তে মানুষের কেছুই কইরবার নাই। দেবতার সাথে বিপদ কইরবার ক্ষমতা মানুষের নাই। কিন্তুক মাইনষের কোপ যদি আর এটা মাইনষের উপর পড়ে আর এ কোপ খাওয়া মানুষটা যদি দেবতার কাছে আর্জি জানায়, বিচার চায় তখন দেবাংশী কি কইরবে। কি করা কর্তব্য তার ?

মোক্ষ— এলা কি কছেন, মুই কেছুই বুঝা পারছি না।

সারবান — তিরিশ বছর আমি মানুষের আর্জি শুনিছি। রোগ-শোক, জরা-ব্যাধির কথা শুনিছি। ভূতপেত জিন মাদারে ধরা মানুষক দেখিছি। বাজা মাওর দুঃখ দেখিছি। ছই মরনী মাওর কান্না শুনিছি। মা বিষহরিক সুরন কইরে— বিধান দিছি। এলা বিচার মোর সাধ্যের মধ্যে আছল, মা বিষহরির কিরপায় মোর নাম হইছে-যশ বাড়িছে। এ্যাতদিন কুন বিপদ হয় নাই। কিন্তুক জোতদারের ফেরৎ কবলার নিষ্পত্তি মুই ক্যামকা করে করমো।

মোক্ষ— কি কছেন ফেরৎ কবলার নিষ্পত্তি।

সারবান— হুঁ, সেতু বর্মনের জমি দেবেন মণ্ডল ফিরত দিবার চাহে না। সেতু মা বিষহরির কাছে

তার বিচার চায়।

মোক্ষ— হাও মাও এলা বিষয় সম্পত্তির বিচার দেবতার কাছে চাছে মানুষ।

সারবান— হঁ, খালি রোগ-শোক নয়, মা বিষহরির কাছে এমন সব কেছুর বিচার চাবা ধরিছে মানুষ। কেবল শুরু হইছে। ইয়ার শেষ কোটে মুই জান না। তাতেই ত কছি মোক্ষদা, তোর দেবাংশীর বুঝিন ইবার দিন শেষ হইল।

মোক্ষ— তুমি এলা ঝঞ্ঝাটত থাকেন না। কোটথে কিবা হোবে।

সারবান— জান মোক্ষদা, মুই জানো বিচারের আয় সেতুর পক্ষে গেলে জোতদার মোক ছাইড়বে না।

মোক্ষ— সেতুক কন এলা বিচার মা বিষহরি কইরবা পাইরবে না।

সারবান— তা কি মুই কবা পারি। মুই দেবাংশী— মা বিষহরি মোর মুখে কথা ফোঁটায়। চল্লিশ বছর ধইরে মানুষ মোর কাছে বিচার চাছে, আর্জি জানাছে— আইজ কি মুই সেতুক ফিরাবা পারি? কবা পারি সেতু এলা বিষয় সম্পত্তির বিচার মা বিষহরি করবা পারবে না।

মোক্ষ— তেবে কি হোবে।

সারবান— কেছু মোক কবাই হোবে।

মোক্ষ— কিন্তুক—

সারবান— মোক্ষদা, সেতুর দুঃখ তুই বুজবুনা। মুই বুজি। ফেরৎ কবলার কলে গরীবের জমিন জোতদার খাবা চায়। মোর বাপও চার বিঘা জমিন দেবেন মণ্ডলের বাপের কাছে ফেরৎ কবলা করিছিল বুনের বিয়ার সম। ধাপ মইরে গেল। পাঁচ বছর বয়স আমার। বাপ ট্যাকা শুইধবা পারে নাই। তাই জোতদার মোক বেগার খাটাইছে পাঁচ বছর। তারপর বিরাম গুণমান আইল, মুই দেবাংশী হনু। দিনরাইত খাটিছি— ট্যাকা জমা করিছি। মনত বড় আশা আছল বাপের ধার শোধ কইরে নিজের জমিন নিজে চাই করমো। কিন্তু সি জমিন মুই আর ফেরৎ পাও নাই। এখন সি জমিন জোতদার খাস দখলে ভোগ করছে।

মোক্ষ— কিন্তুক তুমি এলা ঝঞ্ঝাটত গেলে জোতদার ফির কিবা কয়?

সায়বান— কিন্তুক মুই কেছু না কইলে সেতুর ছ'বিঘা জমিন যে জোতদারের পেটৎ যায় মোক্ষদা। কেছু মোক কবাই হোবে।

মোক্ষ—মোর বুক কাঁপছে। মোর ভয় নাগেছে কিবা হয় তোমার?

সারবান— ভয় মোরও নাগছে মোক্ষদা। জবর ভয়। ভয়ে মোর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়া আওছে। চক্ষু মুদে মা বিষহরিক স্মরণ করবা চাছি, না মা বিষহরি নয়, দেখছি খালি মানুষ মানুষ আর মানুষ। লেইংটা,

শুইটকা না খাতে পাওয়া দুঃখী মানুষ চোখে জল, দুহাত সামনে বাড়ায়ে ধরিছে, কাছে দেবাংশী বিচার কর। বিচার হারা বিচার চাই। হা মাও বিষহরি— আর মোক পরীক্ষা করেন না মাও, মোক ছুটি কইরে দে মোক ছুটি কইরে দে।"

এরপর মা বিষহরির থানে পরের দিন আবার স্নান করে ভেজা কাপড়ে এসে অন্যমনস্ক দেবাংশীর কাছে সেতু বর্মন তার ফেরৎ কবলা জমি পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে বলে— ''মাও দেবেন মণ্ডল মোর ফিরত কবলা ফেরত দিবা চাহে না। মুই তোমার ঠে বিচার চাও মাও।

সার— ?

সেতু— মাও কাইল মোক ফিরে দিছেন। আইজ তোমাক কেছু করবাই হোবে।

মার— ?

সেতু— মোর উপর গোঁসা করেন না মাও। যদি মোর রপরাধ হয়া থাকে মোক শাস্তি দেন মাও। জোতদার এমন জমির দখল নিবা চাছে। মোর পরিবার ছইল পেলে থি ভাস্যে যাবে মাও। গরীবের আর্জির কুন দাম নাই।

সার— জমি কার দখলে আছে?

সেতু— মোর।

সার— জমি চষিছে কেয়। তুই না দেবেন।

সেতু— মুই মাও।

সার— জমিত ফসল আছে?

সেতু— হ। জমি ভরা ধান। দু হপ্তার ভিতরে কাটা যাবে, সেই তংকেই তো দেবেন মণ্ডল জমির দখল নিবা চাছে।

সার— ট্যাকা শোধ কইবার সময় পার হয়া গেইছে?

সেতু— ই সনের আষাঢ় মাসে ট্যাকা শোধ দিবার কথা আছল। মুই মণ্ডলক কছি মোর আর দুটা মাস সময় দেন মণ্ডল। মুই বেবাক ট্যাকা শোধ কইরে দিম।

সার— মণ্ডল তাত রাজী হইছিল?

সেতু— হ। মণ্ডল কইল ঠিক আছে তাই দিস। ফির কেবা ওঁক তাতাইছে। কছে ট্যাকা এইনই দ্যাও তো দ্যাও নাতে জমি আমার।

সার— জমির দখল ছ্যাড়বু না।

সেতু— (থেমে) মাতাজী?

সার— মণ্ডল উচ্ছেদ করবা চালে মা বিষহরির নামে বাধা দিবু। ই নে মায়ের থানের মাটি গলাত

তাবিজ করে ঝুলাবু। (সারবান মন্ত্র পড়ে, দৃঢ় কণ্ঠস্বর। শক্ত চেয়াল। চোখ স্থির। যেন দেববানী দিচ্ছে।)

সেতু— জয় মাও বিষহরি, ধন্যি তোমার বিচার। ইবার দেখি মণ্ডল ক্যামকা কইরে জমির দখল নেয়। জয় মা বিষহরি। জয় দেবাংশী।"

দেবাংশীর কাছ থেকে এই বিচার পেয়ে সেতু বর্মনের বুকে বল ফিরে পায়। এমনকি ভাঙ্গা কোমর সোজা করে খাড়া হয়ে বাঁচতে চায় এবং বাঁচার পথ ফিরে পায়। কিন্তু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেবেন মণ্ডল লোক দিয়ে দেবাংশীকে ডেকে তার বাড়িতে নিয়ে এসে ধমক দেয় এবং বলে তুমি সেতু বর্মনকে নিদান দিয়েছ জমির দখল না ছাড়বার। এর উত্তরে সারবান জানায়, আমি নিমিত্ত মাত্র। মা বিষহরি আমার মুখ দিয়ে যা নিদান দিছে তাতে আমার কিছু করার নেই। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন মণ্ডল জানায় যে, তুমি দেবাংশী মানুষ দেবাংশী হয়ে থাক। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে মাথা দিলে আমি তোমার মাথা ছেটে দেব। অর্থাৎ প্রাণের ভয় দেখায়, অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এমনকি সুবিচারের জন্য তিনি আদালতে সেতুর নামে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানায়। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় যে, দেবেন মণ্ডলকে সাপে কাটে এবং মারা যায়। তখন গ্রামের সকল মানুষের প্রচার হতে থাকে দৈবের কৃপায় সাপের দংশনে দেবেন মণ্ডল নিহত হয়। দেবাংশী অভিশাপে দেবেন মণ্ডলের দুর্ব্যবহারের জন্য এই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে গ্রামের সকল মানুষের মনে দেবাংশীর উপর বিশ্বাস আরও গভীরতর হয়।

এই নাটকে দক্ষিণদিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের সমাজ-ব্যবস্থায় দেখা যায় সারা বাংলা জুড়ে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অপারেশন বর্গা চালু হওয়ার সুবাদে আধিয়ার বা বর্গাদারের নামে জমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার জীবন্ত আর্থ-সামাজিক নিদর্শন প্রকটিত হয়ে উঠেছে গ্রামের মণ্ডপতলায় মানুষের মুখে উহিনী সরকারের (মণ্ডল) জাফরকে জমির দখল ছেড়ে দেওয়া এবং মামলা তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। গ্রামের মানুষের কথাবার্তার মাধ্যমে বাওনা ও জাফর নামে দুই আধিয়ারের মধ্যে উহিনী সরকার যে বিবাদ লাগিয়ে দিয়েছিল তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাই গ্রামের অধিবাসীর কথা প্রসঙ্গে বাবু, কমল, নগনা ও মনির মধ্যে কথা প্রসঙ্গে বাবু বলেন— ''উহিনী সরকার নাইগে দিছে ঠোকাঠুকি বাওনা আর জাফরার ভিতর।

কমল— দুজনাই তো সরকারের আধিয়ার রে।

বাবু— আরে সরকারের বুদ্ধির তুই নাগাল পাবু, বাওনাক দিয়া জাফয়ার নামত নালিশ করিছে কোটত। পাছত থে নিজে বইসে খুঁটি চালান দিছে।

নগনা— বাওনা তো ফৈড়া অমার জমি কোটে?

বাবু— আরে সরকার কি কম ধরিবাজ? চককাশী মৌজাত সরকারের যি ছয় বিঘা জমি আছে উঠা জাফর আদি করছে সেই কদ্দিন থেইকে।

মনি— তুই কেছুই জানিস না। ঐ জমিটা পরথম আধি করছিল বাওনা। উহিনা সরকার জমিটা বেঁচেছিল এক মোসলমানের কাছে। বাংলাদেশ থে আইছিল বুড়া! জমি বেচবার সম বাওনাক ভজুং ভাজুং দে জমি ছাড়ান দিল সরকার। তে সি মোসলমান বুড়া জমি কিনে ফির আধি দিল জাফরক। কিন্তুক বুড়া বেশিদিন থাইকলনা এ দেশে। যাবার সম ফির ঐ উহিনী সরকারক জমিটা বেইচে গেল। ত্যাখন থে ঐ জাফরই এ জমিটা আধি করছল জাফরের সাথ বুঝি সরকারের বনিবনা হচ্ছিল না, নাকি গত সনে সেটেলমেন্টের সম জমিটা বাওনার নামে বর্গা রেকর্ড করি দিছে। এখন বাওনাক দিয়ে মামলা করাছে জাফরের নামে।"

উহিনী সরকার কৌশল করে জাফরের নামে বাওনাক দিয়ে মামলা করার ফলে জাফর জমির সত্ত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দেবাংশীর কাছে আর্জি জানায়। অসহায় গরীব জাফরের বিনীত আর্জি শুনে সারবান জাফরের উদ্দেশ্যে আদেশ করে বলে— ''জাফর উহিনী মণ্ডলকে ডাকা করা। যায়ে ক দেবাংশী ডাকিছে। খেরা থানে।" দেবাংশী ডাকে সাড়া দিয়ে উহিনী জাফরের নামে জমির সত্ত্ব ছাড়ার কথা কবুল করে এবং মামলা তুলে নিতে রাজী হয়ে যায়, তা জানা যায় রুহিনী মণ্ডলের বাড়িতে অনুষ্ঠিত একটি গ্রাম্য জমায়েতে রুহিনীর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর, সুধীর, পঞ্চানন এবং বিনোদের মধ্যে আলোচনার সূত্র ধরে। তাই তাদের মধ্যে কথোপকথনের মাঝে রুহিনী বলে ওঠে— ''মোক জাফরার আধিসত্ত্বের কথা কইল মামলার কথাও তুইল। মুই কনু মামলা মুই করনাই। তখন মোক কইল মাও মোক সব কথা কইছে— বাওনাক সামনে খাড়া কইরে তুমি মামলা চালাচ্ছেন। আর শালা বাওনা অটে আছল— শালা বোগদা কাঁদে কাটে ঐ কথা দেবাংশী পা জড়ায়ে ধরে বেবাক কথা ফাঁস করে দিল।

সুধীর— অ ফির কি কইল?

রুহিনী— মোক কইল জাফরার জমির সত্ত্ব ফিরে দেও সরকার মাও বিষহরির আদেশ। মোক ডর দেখাল মাওর আইজ্ঞা না মাইনলে ফল খারাপ হোবে— দেবেন মণ্ডলের কথা মনে আছে তো। মোর সব আউলে গেল। মুই পরাণের ভয়ে বেবাক কবুল করে ফেলানু।"

মোটকথা রুহিনী মণ্ডল মন থেকে না চাইলেও বাধ্য হয়ে জাফরের আধি করা জমির সত্ত্ব ফিরে দেয় এবং বাওনাক দিয়ে যে মামলা করেছিল তা তুলে নিতে বাধ্য হয়— এই আর্থ-সামাজিক বাস্তব চিত্র দেবাংশী নাটকে অতি নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

এই দেবাংশী নাটকের কাহিনীর পরিণতিতে লক্ষ করা যায়, দেবেন মণ্ডলের ছোট ছেলে

বিনোদ শহরে থাকে। কলেজে লেখাপড়া করে, মাঝে মাঝে গ্রামে আসে, নেশা পান করে, এমনকি বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করে। বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করে বেড়ায়, এমনকি গ্রামের মেয়েদের প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। পিতা দেবেন মণ্ডলের মৃত্যুর পর বিনোদ পড়াশুনা ছেড়ে বাড়িতে এসে জমি-জায়গার সব ভাগ করে নিয়ে গ্রামে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রামের মানুষের মুখে বিনোদ শোনে তার বাবার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে দেবাংশীর অভিশাপে— এ কথা শুনে সে দেবাংশীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য দেবাংশীকে অপমান করে বলে— ''হে! সাধু সেজেছে পূজাপাটি নিয়া থাক। কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে তুমি নাক গলাবার কে হে শালা? ... শালা খেত মজুর, চাষী, বর্গাদার— সবাইকে তাতাচ্ছ।'' এই কথা বলে দেবাংশীর নাকে আঘাত করে এবং রক্তাক্ত দেবাংশীর নাক থেকে রক্ত ঝড়তে থাকে। তখন গ্রামের মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুললে ও তারা বিনোদরে সঙ্গে পেরে ওঠেনি। আবার সেতু বর্মনকে জানায় যে, বাবার মৃত্যুর পর আমি তোমার ছ'বিঘা জমির ফেরৎ কবলা খানির মালিক। এখন তোমার অপরিশোধিত টাকা আমিই নেব। তবে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল, তাই ছ'শ টাকার পরিবর্তে বার'শ টাকা দিতে হবে এবং এখনই দিতে হবে। সেতু অনুরোধ করে ধান ওঠার পর বার'শ টাকার পরিবর্তে আট'শ টাকা দিতে চাইলেও বিনোদ রাজী না হয়ে বরং তিন দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে কবলা ফেরৎ নিয়ে আসার জন্য সেতুর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তিনদিনের মধ্যে টাকা না পেলে ফল ভালো হবে না বলে সেতুকে শাসায়। মোটকথা, গ্রামের সাধারণ অসহায় গরীব চাষীদের উপর জোতদার দেবেন মণ্ডলের ছোটপুত্র বিনোদের শোষণমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিষ্ঠুর ও করুণ ছবি এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে।

এরপর সেতু বিনোদকে বলে আমার পেছনে লাগলে তোমারও বাবার মতো অবস্থা হবে। এবং মারমুখী হয়ে বাড়ি থেকে বিনোদকে বের করে দেয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফলে দেখা যায়, বিনোদ সেতু বর্মনের উপর রাগের মাথায় আক্রোশ বশতঃ প্রতিশোধ নেবার জন্য তার বিবাহিতা মেয়ে সুশীলাকে ধর্ষণ করে। সুশীলা এই ঘটনায় লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে মা বিষহরির খেরা থানে দেবাংশীর কাছে বিচার চায়। তখন দেবাংশী স্থির দৃষ্টিতে প্রথম সুশীলাকে বলে, মা তুমি এত লোকের মধ্যে দেখিয়ে দাও সেই অপরাধীকে। তখন সুশীলা অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্য থেকে বিনোদকে টেনে বের করে আনে। প্রথম দেবাংশী বলে আমি কোন দেবতা নই। দেবের অংশও নই। তাই যে পূজা আমি নিয়েছি সে পূজা নেওয়ার অধিকারও আমার নেই। আসলে আপনাদের দশজনের মতো আমি সাধারণ মানুষ। তাই আজ সে মানুষের দরবারের উপর বিচারের ভার অর্পন করে। এখানে বাবা-ভাই-স্বামী যারা আছেন, আপনাদের

পরিবারের ইজ্জৎ বাঁচাবার দায় আপনাদের সেই কারণে আপনারাই এই অপরাধীর বিচার করুণ, সাজা দেন।

এই নাটকের পরিশেষে দেখা যায়, দেবাংশী নিজের অনুভবেই দেবত্ব পরিত্যাগ করছেন। আসলে এই দেবাংশী দেবত্ব থেকে মানুষের উত্তরণের নাটক। এই জেলার গ্রামীণ সমাজে যে মানুষগুলো তাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ব্যথা, বেদনা, রোগ, শোক, ক্ষুদ্রতা মহত্ব ইত্যাদি নিয়ে তারা সমাজে বাঁচে, সেই মানুষগুলোই দেবাংশী নাটকের মূল চরিত্র। এবং দেবাংশী হল তাদের মধ্যে মূল বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতিনিধি জোতদার-জমিদার দেবেন মণ্ডলসহ অন্যান্যদের মধ্যে গ্রামের সাধারণ চাষী আধিয়ার বা বর্গাদার মানুষের বাঁচার প্রধান স্তম্ভ বা খুটি জমিকে কেন্দ্র করে যে লড়াই এই নাটকে সংঘটিত হয়েছে। মোটকথা, এই নাটকে মূলত রোগের চিকিৎসা, ভূত-প্রেতের আক্রোশ প্রভৃতি সমস্যামূলক জায়গায় ক্রমশ স্থান নেয় জমি-জমার বিহিত-ব্যবস্থা। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাগচাষী, চাষী-মজুরদের দেবাংশীর নিকট তাদের প্রার্থিত বস্তুরও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাই গ্রামের সাধারণ গরীব চাষীদের এক টুকরো জমিও গ্রামের জোতদার, দেওয়ানী প্রভৃতি ধনবান শ্রেণীদের লোভের শিকার হয় এবং তারা সুযোগ মতো সেই জমি আত্মসাৎ করে। সেই সূত্রে দেখা যায় সেতু দেবেন মণ্ডলের শিকার, জাফর রুহিনী সরকারের শিকার এবং শিকারগ্রস্থ গ্রামের মানুষদের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে দেবাংশী এই গ্রামের কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের (জোতদার, জমিদার, দেওয়ান) শিকার হয়। তার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রূপে এই দেবাংশী নাটকে নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বেশ নিপুণতার সঙ্গে ও অতিপুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছেন।

অখণ্ড বাংলার দিনাজপুর জেলার আধিয়ার-কৃষকদের তেভাগার মরণজয়ী সংগ্রাম অবিস্মরণীয় বিদ্রোহ ও আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পটভূমি বিপুল সম্ভবনাময় নানা ঘটনায় উদ্বেল। এই সময়ে ফ্রেব্রুয়ারিতে লক্ষ করা যায় কলকাতার পথে পথে রশিদ আলি দিবসের দুর্জয় অভিযান চলছে। বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ এক নতুন পথের ইঙ্গিত দেয়। ২৯ শে জুলাই কলকাতার শ্রমিক শ্রেণি লড়াইয়ের মাঠে পদার্পণ করল। এর ফলে হল সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটগুলির ধর্মঘট। কিন্তু এই রূপ পরিস্থিতিতে শত্রুরা চুপ করে বসে না থেকে বরং তারাও আঘাত হানল। আঘাত নেমে আসে নির্মম দাঙ্গারূপে আগস্ট মাসে। এমনকি এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা যেন মনে হল গোটা বাংলাদেশকে গ্রাস করবে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের রক্তস্রোতে স্বাধীনতার দাবি অনিশ্চয়তার অতলে ডুবে যায়। ঠিক এই রকম এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে (১৯৪৬-৪৭খ্রি:) বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেয়। অর্থাৎ

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সারা দেশব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা তেভাগা সংগ্রামের ডাক দিল— যা ছিল বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নয়, দুই-তৃতীয়াংশ দাবির সংগ্রাম। মোটকথা উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ অধিয়ারের এবং ১/২ অংশ জোতদারের। এই তেভাগার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট রচিত হয় দিনাজপুর জেলায়। তাই উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার খাঁপুর অঞ্চলে তেভাগা অন্দোলন জমাট বেঁধেছিল। সাধারণ মানুষের তৈরি একটি সংগঠন মৃদুভাবে দানা বেঁধেছিল। এমনকি এই সংগঠন জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে একটি শ্রেণি-ভাবনার জন্ম দেয়। এর ফলে এখানকার কৃষকরা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্যমতায় তেভাগা মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তেভাগা অভিযানে নেমে পড়ল। এ জেলার স্থানীয় ভাগচাষী কৃষকদের গরিষ্ঠ অংশছিল রাজবংশী, সাঁওতাল, ওরাওঁ ও মুসলমান। জমিদার জোতদারদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অন্যান্য জেলা থেকে আগত হিন্দু ব্যবসায়ীর দল। প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মাফিক স্থির হয় পরবর্তী ফসলের মরশুমেই তেভাগা সংগ্রাম শুরু হবে। পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে পড়লে কৃষকদের মধ্যে স্লোগান ওঠে— 'জোতদারের গোলায় বা খোলানে ধান নয়, নিজ খোলানে ধান তোল', আধি নাই তেভাগা চাই, এবং কর্জ ধানের সুদ নাই-এই তিনটি দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হল। ভাগচাষিরা দল বেঁধে ধান কেটে নিজ খোলানে ধান তুলতে লাগল। এবং কৃষক ভলন্টিয়াররা এই কাজে ভাগচাষিদের যথেষ্ট সাহায্য করে ও কাঁধে কাঁধ মেলায়। বিশেষ করে খেতমজুর, গরীব চাষি, মাঝারি চাষি প্রত্যেকেই এই জেলার অল্পবিস্তর সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। যেসব এলাকায় খোলানে ধান তোলা হয়ে গেল সেখানে ঠিক হলো জোতদারকে আইনসঙ্গত নোটিশ দিয়ে ধান ভাগ করা হবে। ভাগচাষিরা তেভাগা কায়েম করবে বলে সম্মত হল। তাই তারা জোতদারকে যথারীতি নোটিশ দিল। কিন্তু জোতদাররা সে নোটিশ অস্বীকার করল। তখন ভাগচাষিরা বাধ্য হয়ে গাঁয়ের দশজনকে সাক্ষী রেখে মোট ধান তিনভাগে ভাগ করল। দেখা গেল ভাগচাষী দু ভাগ নিয়ে জোতদারের জন্য এক ভাগ রেখে দিল। এর ফলে প্রশাসনের টনক নড়ে উঠেছিল, তাই পুলিশ তেভাগা আন্দোলন দমনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি বালুরঘাট মহকমুার খাঁপুরে ভাগচাষী কৃষকদের তেভাগা লড়াইয়ের উপর পুলিশ ও জোতদাররা আক্রমণ হানে। অর্থাৎ গাড়ি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ এল দমন-পীড়ন চালাতে। রাজবংশী সাঁওতাল ও মুসলমান ভাগচাষী কয়েকশো কৃষক প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসে। তখন পুলিশ উন্মত্ত হয়ে কৃষকদের উপর নির্মমভাবে ১২১ রাউণ্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে ১৪জন মারা যায় ও ৮জন হাসপাতালে মারা যান। প্রাণ দিলেন যশোদা রাণী, কৌশল্যা কামারাণী, চিয়ার শাই শেখ, হপন, মার্ডী সহ মোট ২২ জন মরণজয়ী বীর। এবং সেই সঙ্গে বীর কৃষকদের অসীম শৌর্য ও আত্মাহুতি চির উজ্জ্বল হয়ে

আছে। শহীদদের রক্তে খাপুরের মাটি সিক্ত হল।

মোটকথা ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে তেভাগার জন্য ভাগচাষী কৃষকদের যে সংগ্রাম শুরু হয়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তা চরম পরিণতি ঘটে বেশ কিছু শহীদের মৃত্যুতে। এ জেলার খাঁপুর গ্রাম সেই মর্মন্তুদ ঘটনার উজ্জ্বল সাক্ষী। তাই উত্তরবঙ্গের সমাজ- মানসিকতায় তেভাগা আন্দোলন নিয়ে একটি ক্লাসিক শ্রেণির নাটক 'মন্ত্রশক্তি' লেখেন জেলার স্বনামধন্য নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তিনি জেলার এই খাঁপুর অঞ্চলের সংঘটিত তেভাগার মর্মন্তুদ পটভূমিকার জীবন্ত স্বরূপ 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে ঘরের সাধারণ মানুষদের সংগ্রাম, সাহস এবং দেশপ্রেম বেশ বাস্তবোচিতভাবে ও জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে। তাই দেখা যায়, এতদ্অঞ্চলের সাধারণ স্তরের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষেরা বাঁচার তাগিদে এই তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল, সেই কারণে নিছক আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই আন্দোলন নয় বরং এর মধ্যে আদর্শবোধ কাজ করেছিল। একদিকে আদর্শ আর অপরদিকে আদর্শহীন প্রশাসন— এই দুই শক্তির প্রবল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নাট্যরূপ সৃষ্টি হয়েছে 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে। মোটকথা তেভাগা আন্দোলন সামান্য দু-মুঠো ধানের আন্দোলন হলেও এখানকার ভূমিজ কৃষকেরা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঁচার লড়াইয়ে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল— তার বাস্তব সম্মত ও নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত এই নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব নির্মলেন্দু তালুকদারের যুক্তিযুক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— 'রংপুরের কৃষক নেতা নুরুলদীনের নেতৃত্বে এই জেলার মানুষেরা যেমন নীল বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন, তেমনি এ জেলার মানুষেরা বাঁচার লড়াইয়ে তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছেন। যশোদা বর্মণকে আজও আমরা ভুলিনি। আবার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও এ জেলার মানুষের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। তাই পরবর্তীকালে পশ্চিম দিনাজপুরের নাট্যচর্চায় একটি প্রধান ধারা গুণমুখী হয়ে উঠেছে। বহুদিনের প্রচলিত গতানুগতিক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাট্যচর্চার পাশাপাশি এই অঞ্চলে 'ছেঁড়াতার', 'নীলদর্পণ', 'দেবীগর্জন' এবং 'মন্ত্রশক্তির' মতো নাটকে ভূমিজ সন্তানদের বাঁচার লড়াইয়ের সোচ্চার সংলাপ শোনা যায়।"[৯]

এই নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি অত্যন্ত অসহায় গরীব জনমজুর গৃহকর্তা রসুল আলী স্ত্রী আমিনা ও একমাত্র সন্তান রসিদকে নিয়ে খুব পরিশ্রম ও কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে। বাড়িতে অভাবের তাড়নায় সে গ্রামের জোতদার মুখার্জীর বাড়িতে দিনমজুরীর কাজ করে কিন্তু মজুরি সঠিক সময়ে না পাওয়ায় তাকে বাধ্য হয়ে পাড়ায় সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে রাতের বেলায় সিঁদ কেটে চুরি করেও খোরাক যোগাতে হয়। এবং যথেষ্ট কষ্ট করে রসুল পরিবার নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। তাই রসুল ও আমিনার মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাদের দৈনন্দিন দুরবস্থার

কথা ও গ্রামের ভাগচাষী কৃষকদের তেভাগা আদায়ের জন্য লড়াইয়ের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদার নেতৃত্ব দিয়ে উক্ত অঞ্চলের সব ভাগচাষী কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেছে তেভাগার পক্ষে। মোটকথা গ্রামের ভাগচাষী কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগ পাওয়ার জন্য তেভাগা আন্দোলনে স্বতস্ফূর্তভাবে মেতে উঠে তারা রাতে রাতে সকলে সংগঠিত হয়ে মিটিং করে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। অন্যদিকে জোতদার মুখুটি, রজব আলী, মদন কুণ্ডু প্রভৃতি বিত্তবানের দল স্থানীয় প্রশাসনকে পাশে নিয়ে তেভাগা প্রতিরোধ করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করে চলেছে। বিশেষ করে সেই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা গ্রামের ভাগচাষী কৃষকদের অর্থনৈতিক অবর্ণনীয় খারাপ অবস্থা দূর করবার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে কৃষকদের তেভাগার অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এর ফলে ভাগচাষী কৃষকদের সঙ্গে গ্রামের জোতদার বাবুদের সংঘর্ষের মাধ্যমে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে—

রসুল : ''... একদিন কাম তো তিন দিন বেকার। শালা তেভাগার জ্বালাত রাতের ধান্দাও হবা বসিছে।

আমিনা : ক্যান, তেভাগা ফির কি কইরলো?

রসুল : বাড়ির ভিতর থাকিস, কেচুই ট্যার পাইস না। আজ তিনমাস হইলো গাঁওত শুরু হইচে এক হজ্জুত। তেভাগা কইরবি কর, তাত হামার কেচু করার নাই, কিন্তুক শালা রাইতে ছাড়া অমাহরের কাম নাই। দিনের বেলায় কেচ্চু ঠাহর পাইবি না। সব মুখত চাবী আইটে যে যার কাম করোছে। রাইত হইলো কি শুরু হইলো ফিসফাস ... এটে সেটে মিটিন। রাত তিনটার আগে কেউ শালা বিছানাত যাবে না। তে সিঁদ কাইটমো কখন?

আমিনা : চাষীগুলোনের বাড়িত তো আর সিঁদ কাইবপা না। তারা জাইগে থাইকলে দোস কি?

রসুল : তোর দেখছি জবর বুদ্ধি। চাষাগুলান মিটিন করোছে তে বাবুগুলানের ঘুম নাই। চাষাগুলান মিটিন করোছে কেমন কইরে তে ভাগা কইরবে। আর মুখুটি, রজব আলী, মদন কুণ্ডু এরা মিটিন করোছে ক্যামন কইরে তেভাগা রুখা যায়। দারোগা, মাখন আই.বি. চৌকিদার... এরা মিটিন করোছে ক্যামন কইরে সামসেরকে ধরা যায়।

আমিনা : অয় ফির কে? অক ধইরে কি হোবে?

রসুল : আরে অয় হছে নেতা। অয়তো চাষীগুলানক তেভাগার তংকেখে পাছে। অয় হছে কমনিস। দেশের শত্রু, বুঝা পাইরলি? অর মাথার দাম কত জানিস? এক হাজার ট্যাকা।

আমিনা : বাবা, এ হাজার ট্যাকা! এক হাজার ট্যাকায় কত কুঁড়ি হোবে?

রসুল : তা ধর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০- দশ কুঁড়ি।

আমিনা : বাবা, দশ কুড়ি!

রসুল : তেবে?

আমিনা : তে অক ধরায় দিলেই হয়?

রসুল : অত সোজা ভাবিছু? অক দেখাই যায় না। একটু আগে এটে, ফির অন্যটে। এক জায়গায় থির থাকে ভাবিছু? কেবল ঘুরা বেরাছে। অক ধরায় দিবে কে? অক কেউ চিনেই না।

আমিনা : চাষীগুলান চিনে না?

রসুল : ধুর চাষী, পুলিশই অক চিনে না।

আমিনা : হায় মাও— পুলিশও চিনে না?

রসুল : পুলিশকে অয় নাচায়ে বেড়াছে। তেবে একজন মনত হয় অক চেনে।

আমিনা : কে গো?

রসুল : যশোদা দিদি।"

'মন্ত্রশক্তি' নাটকের কাহিনীর মাঝে সরকারের চৌকিদার রহমত আলী দুপুর রাত্রে লণ্ঠন নিয়ে গ্রাম পাহারা দেওয়ার সময় রসুলকে সন্দেহ করে তার বাড়িতে এসে তাকে ডেকে নিয়ে তেভাগার নেতা সামসেরের গ্রামে মিটিন করার বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে তেভাগা আন্দোলনের বিষয় নিয়ে কথা প্রসঙ্গে রহমত বলেন— ঠিকই কছিস রে, গরীবের বাঁচন নাই।

রসুল : পোদ্দার আমাহরের মাতাত কাঠাল ভাইঙ্গে খাছে, উদিক চাষীগুলানক নেইংটা করোছে রজব আলী আর মুকুটি।

রহমত : আরে চাষের ফসল তো আর চোরাই মাল নয়।

রসুল : কিন্তুক ভাগের সমতো চোরাই মালের হিসাবেই ভাগ হছে ফসল।

রহমত : ইটা মাইনবা পাইরলাম না। ক্যান, আধা আধিত অন্যায় কি দেখলু তুই?

রসুল : অন্যায় নাই?

রহমত : নয়।

রসুল : রোদে পুড়া পানিত ভিজা চাষ কইরবে কে? বর্গাদার। সুখা বান এলাকায় ঝক্কি পোয়াবে কে? বর্গাদার। পোকা-মাকড় গরু-শুয়ার এলার থে ফসল বাঁচাবে কে? বর্গাদার। কাটান-ঝাড়ান, মাড়ানি এলাকে কইরবে? বর্গাদার। তুমি জোতদার-ঘরে বইসে ঠ্যাং-এর উপরে ঠ্যাং তুলা দিয়া ফসলের আধাভাগ গোলাত তুইলবেন। ইটা ঠিক হিসাব? পোদ্দারের হিসাবের সাথ ইয়ার তফাৎ কি?

রহমত : হ্যারে, এলা তুই কি কছিস? তুই কি তেভাগার দলত?

রসুল : হুর বাপু, মুই এক ছটাক জমি বর্গা করি না, মোর তেভাগা কি দরকার?

রহমত : কিন্তুক তেভাগা হোক, ইটা তুই চাইস, ঠিক কি না?

রসুল : হ চাই। ক্যান, তুমি চাও না? (রহমত তাকায়) তুমিও তো বর্গাদারগুলার মত নেইংটা। দশ টাকা মাইনাত তোমার চলে?

রহমত : (নীরব)

রসুল : তোমার মাইনা ২৫ ট্যাকা হইলে ক্যামকা হয় চাচা?

রহমত : সি কি আর হোবে রে। এই তোর গা ছুয়া কছি, সরকার যদি মোক ২৫ ট্যাকা মাইনা দেয়, মুই এলা ছ্যাঁচড়া ধান্দা ছাইড়ে দেমো। কিন্তু সরকার বেকারের মাইনা বাড়ায়— আমাহরের তকে লবডংকা।

রসুল : তে তুমি যদি ২৫ ট্যাকা মাইনার তংকে সরকারের কাছা দরবার কর, চাইকি সব চৌকিদারের সাথ মিলা যদি লড়াই কর, সিটা অন্যায় হোবে?

রহমত : (নীরব)

রসুল : হোবে না তো?

রহমত : (নীরব)

রসুল : তে তেভাগার তংকে বর্গাদারগুলান যি আওয়াজ তুলিছে, সিটিও অন্যায় নয়। কি চাচা, কিছু ভুল কনু?

রহমত : নয় ঠিকই কছু। কিন্তু জোতদারগুলানের বন্দুক আছে, লাঠ্যাল আছে, ফির পুলিশ, দারোগা, সরকার আমাহরের পাছত আছে। তেভাগা কেচুতেই কইরবা দিবে না, মাঝের থে চাষাগুলান মইরবে ... ”

উক্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভাগচাষী বর্গাদার কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ২/৩ অংশ আদায়ের জন্য তৈরি কিন্তু অপরদিকে জোতদাররা পুলিশ প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে তেভাগার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনকে দমন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এর ফলে ভাগচাষীদের কপালে

প্রাণে-ধনে মারা যাওয়ার এক প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর ফলে এই নাটকে তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার জীবন্ত চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

এই 'মন্ত্রশক্তি' নাটকের শুরুর পর্বে (দ্বিতীয় দৃশ্য) জোতদার রজব আলী ও মুখুটি বাবুর সঙ্গে দারোগা সাহেবের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের তৎকালীন সরকারী স্তরের ভূমিকা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই উক্ত সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

দারোগা : আপনাদের অবস্থা সঙ্গিন হতে হবে কেন? তেভাগা হলে আপনাদের কি? বাঁশ তো সরকারের।

রজব : কি কছেন ছাড়?

দারোগা: ঠিকই বলছি। তেভাগা হলে আপনারা ২ ভাগের জায়গায় ১ ভাগ পাবেন। কি, ঠিক তো?

মুখুটি : হ ঠিক ছাড়।

দারোগা : এক ভাগে আপনাদের গোলা ভরবে না। সুতরাং দু'হাত তুলে চৈতন্যদেব হয়ে আপনারা সরকারের কাছে আর্জি পেশ করবেন— খাজনা কমাও। কি, করবেন না?

রজব : হ্যাঁ ছাড়, এক ভাগ পায়ে এত খাজনা কেমন করে দেয়া যাবে, কন?

দারোগা : তা হলে বাঁশটা কার যাচ্ছে? আপনারা কম খাজনা দিলে সরকারের আয় কমবে, ঠিক কিনা?

মুখুটি : হ ঠিক ছাড়।

দারোগা : তো ইচ্ছে করে ঝড়ের বাঁশ কেউ পেছনে নেয়? এ বোকা ভাবছেন ইংরেজ বাহাদুরকে? বুঝতে পারছেন না— তেভাগা আইন তৈরি করেও কেন চালু করেনি সরকার? আরে মশাই, তেভাগা নিয়ে আপনাদের চেয়ে সরকার বাহাদুরের মাথা ব্যথা বেশি। সুতরাং কোন চিন্তা নেই। তেভাগা হবে না। মানে হতে দেয়া হবে না।

রজব : আপনার কথা শুইনলে ছাড়, পারান ঠাণ্ডা হয়।

দারোগা : আপনাদের পরান ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু আমাদের পরান যে উড়ে যায়— আমাদের কি অবস্থা ভেবে দেখেছেন? নিশাপুর, ভাতিণ্ডা, চড়কডাঙ্গা— এই তিন গ্রাম মিলে একটা পুলিশ ক্যাম্প, ৮ টা সেপাই, দু'টি রাইফেল।

প্রতিপক্ষ ৪০০-৫০০ লোক। তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি, হাঁসুয়া, কাস্তে, লাঠি— ভাবা যায়?

মুখুটি : আপনেরাই যদি ভয় পান ছাড়, তেবে আমরা কোথায় যামো।

দারোগা : আরে মশাই, আপনাদের ভয় ধানের। আমাদের ভয় প্রাণের। বুঝলেন কিছু? (রজব ও মুখুটি পরস্পর তাকায়) ধরুন, চাষীরা আপনাদের আক্রমন করল। আপনারা বেগতিক দেখে ধানের মায়া ত্যাগ করলেন, প্রাণটা বাঁচল। কিন্তু আমরা? আমাদের তো নিস্তার নেই। আমাদের উভয়-সঙ্কট। মারীচের অবস্থা। সরকারী হুকুম, চাষীদের ধানের তিন ভাগ নিতে দেওয়া চলবে না। মানে আপনার সম্পত্তি আমাকে রক্ষা করবে হবে। কি দিয়ে? ছ'খানা রাইফেল আর আটটা সেপাই নিয়ে। যত্তোসব! ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

রজব : কিন্তু ছাড়, কিছু তো একটা কারা নাগে?

দারোগা : কিচ্ছু করার নেই। তেভাগা হলে আমার কিচ্ছু করার নেই। যা করবার তেভাগা হবার আগেই করতে হবে।

মুখুটি : চেষ্টাতো করোচি ছাড়। দিনরাত কানত মন্তর দেছি তো, তেভাগাত সর্বনাশ—এ ফাঁদত যাস না।

রজব : বর্গাদারগুলান ডাইকলে আসে না। ওদের বাড়ি বাড়ি যায়ে বুঝাইছি তেভাগা কইরলে বীজধান, হাল, লাঙ্গল, বলদ এলা পাবু না। বিপদ-আপদ, ধার-বাকি, দিন-মজুরি বেবাক বন্দ হোবে। কি কমো ছাড়, খালি কথা শুন্যা— যায়-এটা কথাও কয়না। পরম পরম শুনতো, এখন অমাহরের দেইখলেই তিন ঘাটা ধরে। বাড়িত যায়ে পাওয়া যায়না শালাদের। সব সামসেরের চ্যালা হছে।

দারোগা : সেই জন্যই তো বলছি— ও সামসেরকে আটক করতে পারলেই সব ভ্যাবানী থেমে যাবে। ওদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু শালা বিসমিল্লাতেই গলদ। যাকে ধরব তাকেই চিনিনা। একবার শুনি বয়স ২৭, জোয়ান মদ্দ, পাটার মত বুক, অসীম শক্তি, সঙ্গে রিভলবার থাকে।

রজব : হ্যাঁ ছাড়, ঠিক ঠিক।

দারোগা : আবার শুনি ৫৫ বছরের আধবুড়ো, রোগাপটকা চোহারা।

মুখুটি : হ্যাঁ ছাড়, ঠিক ঠিক।

দারোগা : আরে দুর মশাই, একসঙ্গে একটা মানুষের বয়স ২৭ এবং ৫৫ ? একটা লোক একসঙ্গে জোয়ান আর রোগাপটকা হতে পারে ?

(রজব ও মুখুটি পরস্পর তাকায়)

দারোগা : আচ্ছা, লোকটি সত্যিই মুসলমান তো ?

রজব : হ্যাঁ ছাড়, তাত সন্দ নাই।

মুখুটি : আমার মনে হয় অয় ছাড় হিন্দু। মোছলমানের ভেক ধরিছে।

মুখুটি : আমাহরের অঞ্চলের বর্গাদারগুলান তো বেশির ভাগ মোছলমান তাই—

দারোগা : বুঝলাম। কিন্তু কাশীপুর, ধনকইল— এসব অঞ্চলের বর্গাদার তো বেশির ভাগ হিন্দু, না হয় সাঁওতাল।

উপরি উক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার যে তৎকালীন ইংরেজ সরকার তেভাগা আইন পাশ করেও জমিদারদের স্বার্থে পরোক্ষে নিজেদের স্বার্থে সাধারণ ভাগচাষী কৃষকদের শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে নিঃস্ব ও সর্বশান্ত করে তুলেছিল। তাই বাধ্য হয়ে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল ভাগচাষী কৃষকরা সমবেতভাবে ঐক্য ও সংহতিকে বজায় রেখে তেভাগার দাবি পূরণের লক্ষ্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর ফলে ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে ওঠে। এবং তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও আধিয়ার তথা ভাগচাষী কৃষকরাও মারমুখী আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর প্রস্তুতি পর্ব চালিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে উদ্ভূত তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এই নাটকে বিধৃত হয়েছে।

এই নাটকের কাহিনীর পরিণতিতে দেখা যায় গ্রামের জোতদার রজব আলী ও মুখুটি মহাশয় চিরায়ত ইংরেজ তোষণের সূত্র ধরে প্রশাসনের লোকজন বিশেষ করে দারোগা সাহেবকে নানাভাবে আতিথ্য করে। পরিশেষে নানারকম খাদ্যের সম্ভার সাজিয়ে ভুরি ভোজনের আয়োজন করে যাত্রা দেখানোর ব্যবস্থা করে তাকে তুষ্ট করেন। অথচ প্রজারা (কৃষকরা) সারাবছর খেতে পারেন না। আসলে যেন তেন প্রকারেণ প্রশাসনকে উৎকোচ প্রদান ও পরিপোষণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে জোতদাররা কৃষকদের শোষণে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই তারা কোন ভাবেই ফসলের আধিয়ার ছাড়া তেভাগা মেনে নিতে রাজী ছিলো না। আর তাদের এ কাজে সহযোগী ছিল পুলিশ ও প্রশাসন। এমনকি প্রশাসনের উর্দ্ধতম কর্তা ব্যক্তি দারোগা সাহেব জোতদারের কথা মতো পুলিশের চর মাখনকে দিয়ে তেভাগার নেতা সামসেরের খোঁজে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা

করেন। অপরদিকে গ্রামের তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব স্থানীয়া, অসাধারণ বীর ও সিংহীর ন্যায় দক্ষ দাপুটে কৃষক রমণী যশোদা বর্মণের নির্দেশ মতো রসুল গ্রামের সব কৃষকদের তেভাগার স্বার্থে সিরাজুল, অমূল্য ও জগাকে নিয়ে চড়ক ডাঙ্গা, ভাতিণ্ডা ও নিশাপুর— এই তিন গ্রামকে লক্ষ করে জোতদার রজব আলীর কাছারী বাড়ির পুলিশ চৌকিতে সিঁদ কেটে ছয়টি রাইফেল চুরি করে। সেই রাতেই পুলিশের চর মাখন ও জোতদাররা যশোদাকে রীতিমতো সন্দেহ করে এবং দারোগা সাহেব যশোদাকে সন্দেহবশত জিজ্ঞেস করে জানতে চায় চড়ক ডাঙ্গার খাড়ির বাঁশের সাঁকো কে ভেঙ্গেছে? যশোদা উত্তরে জানায় আমার জানা নেই। তারপর দারোগা সাহেব যশোদার কাছে সামসের সম্বন্ধে জানতে প্রশ্ন করে। ''খবর পাওয়া গেছে আজ রাত সাড়ে বারোটায় সামসের তোমার বাড়িতে ঢুকেছে'' এই প্রশ্নের উত্তরে যশোদা বলেন— ''খবর পাইলেন সাড়ে বারোটায় ধইরতে আইলেন সাড়ে তিনটায়? এতক্ষণ সে কি থাকে?''

দারোগা : বাজে কথা ছাড়। বল, সামসের কোথায়?

যশোদা : এই এক কথা শুইনে শুইনে কান পইচে গেইছে দারোগা সাহেব। তিন মাসে কম করে না হলেও শওবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ''সামসের কাল রাইত্তে তোমার বাড়িত ছিল— সামসের তোমাকে খবর পাঠাচ্ছে... সামসের কাল ভাতিন্দায় তোমার সঙ্গে নিয়া তেভাগার মিটিন করিয়াছে ... সামসেরকে তুমি ছাড়া কেউ চিনে না ...।'' সামসের, সামসের, সামসের। এক কথা কতবার ... কয়েন দারোগা সাহেব?''

তখন দারোগা সাহেব নিরুত্তর থেকে যশোদার স্বামী কালীডাক্তারকে আই.বি মাখনের কথামতো সামসের বলে সন্দেহ করে নানা প্রশ্ন করে। তখন কালীডাক্তার জানায় যে, আমি বিন্দাবন পাগলা সেজে মাখনকে বোকা বানিয়েছি। তবে একথা শোনার পরও দারোগা সাহেবের মনে কৌতূহল জাগে যে এই কালী বর্মন ওরফে বম্মন ডাক্তার, ওরফে সামসের আলী। এর উত্তরে কালী ডাক্তার দারোগাকে জানায় যে, বিন্দাবনের খাঁকি পেন্ট আর তালিমারা কেউ এগুলো কি আমার ঝোলাত পেয়েছেন? দারোগা নিরুত্তর থাকে। এরপর দারোগা সাহেব বলেন তাহলে মাখন বাবুর কাছ থেকে প্রথম যে লোকটা টর্চ নিয়ে পালালো সে কে? কালীবাবু জানায় যে, হতে পারে সে সামসের! মোটকথা এই নাটকে পুলিশের চর মাখনবাবু তেভাগা আন্দোলনের জননেতা সামসেরেরও খপ্পরে পড়ে তার মনে হয়েছে সামসের পাগল। আসলে এ 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে 'সামসের' একটি কাল্পনিক নায়ক চরিত্র। এই চরিত্রের কথা বলে যশোদা এবং অন্যান্যরা আন্দোলন সংগঠিত করে। জোতদারদের মধ্যে ধারণা হয় যে, সামসের এক অতি মানব চরিত্র। সে দু ঘন্টার মধ্যে বহু জায়গায় যেতে পারে এবং সামসের কে? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে অধরা। সামসের এই নাটকে এক

আদর্শের নাম। বঞ্চিত, অবহেলিত, অভাবী কৃষকের কাছে সামসের হল প্রেরণা। শুধু তাই নয়, এই সামসেরই তেভাগা আন্দোলনের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। আবার এই সামসেরের কথামতো নগেন ও সিরাজুল বদন মাঝির নৌকা মাজনা খাড়িত ডুবিয়ে ফেলে পারাপার বন্ধ করে দেয়, যাতে করে কৃষকদের ভোররাতে তেভাগার উদ্দেশ্যে ধান কাটার সময়ে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নিতে পারে। এদিকে যশোদার বাড়িতে পুলিশের বন্দুক নিয়েই প্রশাসনিক পর্যুদস্ত করে অর্থাৎ গ্রামের মানুষ দারোগা সাহেব পুলিশের চর সমর্থন, একজন সেপাই এক, জোতদার রজব আলী, মুখুটি মহশয়কে পাহারা দেয়, অপরদিকে ভোর হওয়া মাত্র যশোদার আদেশে গ্রামের ভাগচাষী কৃষকরা ফসল (ধান) কাটার জন্য জমিতে নেমে পড়ে। গ্রামের চারদিক থেকে লোক হাতে লাঠি, তীর ধনুক, কাস্তে ও হাঁসুয়া নিয়ে তেভাগার ধান কাটার জন্য স্বতস্ফুর্ত উৎসাহ ও মহা উদ্যমের গতিতে মাঠে পদার্পণ করে ধান কাটতে শুরু করে। এই নাটকের শেষে দেখা যায়, দারোগা সাহেব আন্দোলন দমন করার জন্য বৃথা গর্জন করছেন আবার কখনো মাখনবাবুকে ক্যাম্পে খবর দেবার জন্য আদেশ করছেন। কিন্তু তারা যশোদার অধীনে বন্দী দশায় থেকে বাধ্য হয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। তাই যশোদার সঙ্গে দারোগা সাহেব ও জোতদার রজব আলির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জেলার তেভাগা আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম তথা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

দারোগা : এই মাখন, যাও ক্যাম্পে গিয়ে খবর দাও।

যশোদা : যাবেন নাকি মাখনবাবু খবর দিবা? (মাখন চারদিকে দেখে। বোঝেন দুরন্ত প্রতিরোধ। সে নিশ্চল থাকে)

দারোাগ : ওফ্! সে পাইকগুলো যে কী করছে!

যশোদা : সিপাইরা ব্যাবাক চৌকিত আটক পড়িছে দারোগাবাবু।

দারোগা : (রসুলকে দেখে) রসুল তুই, তুই... হা ভগবান ...।

(মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে)

যশোদা : আহা, দারোগাবাবু, মাটিত বইসবেন না। বারান্দাত যায়ে বসেন। ইখানে হিম পড়োছে। আলি সাহেব, মুখুটি বাবু আপনারাও যান। আপনাদের অনেকক্ষণ আটক থাকা লাইগবে তো?

দারোগা : মানে?

যশোদা : সূর্য্যি উঠতে না উঠতে মাঠে ধান কাটা শুরু হোবে। তেভাগা— বুঝিছেন। দু'দিন সারাদিন সারারাত ধান কাটা চইলবে নিশাপুর, ভাতিন্দা, চড়কডাঙ্গা... এই

তিন গেরামে। আপনেরা আমার এই বারান্দাত বইসে থাইকবেন। ভয় নাই দারোগাবাবু, পাহারা থাইকপো।

আলি : যশোদা আমাহরে ছাইড়ে দাও নাতে ভুল কইরবা। আমার বাড়িতে দুটা বন্দুক আছে... সিটা চালাবার লোকও আছে।

মুখুটি : আমহারও এটা আছে।

যশোদা : আপনাহরের বন্দুক আছে, সিটা আমরা জানিনা ভাবিছেন?

আলি : তাইতো কছি, ছাইড়ে দাও।

যশোদা : আপনেরা দু'জন তো ইখানে, বন্দুক চালাবে কে? আপনার ব্যাটা আর মুখুটি বাবুর ছেলেতো? আরা তো কুসুম ধোপানীর ঘরোত আটক।

আলি : ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র!

যশোদা : হ আলি সাহেব, ষড়যন্ত্র। আপনেরা আমাহরেক মাইরবা চান। বাঁচার রাস্তাটা তাই আমরা এ্যানা পরিষ্কার কইরে রাখিছি।

দারোগা: সদরে খবর যাবেই, ফোর্স আসবে। তখন মজা টের পাবে।

যশোদা : চাষাগুলান নদীর ঘাট পাহারা দে'ছে। ঘাটের নৌকা ডুবিছে।

দারোগা: শালা সামসেরকে যদি একবার পেতাম—।

যশোদা : সামসেরকে দেইখবেন দারোগাবাবু? আইসেন।

(দরোগা এগিয়ে আসে। যশোদা সব লোকের সামনে আঙ্গুল তুলে বলে) এই। এই দেখেন দারোগাবাবু... ইয়ার ভিতর কে সামসের খুঁজে নেন। (সবার সামনে হাঁটতে থাকে। রসুলের কাছে দাঁড়ায়।)

দারোগা: শালা রসুল— তুই শালা সামসের ও: ! একবারও সন্দেহ হয়নি... শালা ছিচকে চোর ... তোকে ...

যশোদা : ব্যস ... সামসেরকে পায়া গেছেন। যান যান, মাথা গরম কইরে কুন লাভ নেই। বারান্দাত যায়ে বসেন।

(ওরা সবাই বারান্দায় গিয়ে হতাশ ভাবে বসে। কয়েকজন রাইফেল হাতে ওদের ঘিরে রাখে।)

যশোদা : ভোর হয়া আইসলো। নগেন, হাতেম, খালেদ ... যশোদা যাও, সকলকে যায়া কও শিয়ালগুলান সব বাধা পড়িছে। কেউ ডাইকবার আর কেউ নাই... মাঠের দিকে যাতে কও সকলকে। (ওরা চলে যায়) দারোগাবাবু, আলি সাহেব, আমাক

মাঠে যাওয়া নাইগবে। আইজ তেভাগার কাটান তো ... ডাক্তারক রাইখে গেলাম আপনেদের সেবা যত্ন কইরবে। খাওয়া দাওয়া দিবে। তে দারোগা সাহেব, পরনাম।

(যশোদা চাষীদের নিয়ে প্রস্থান করে। পূর্বের আকাশ ফরসা হয়ে আসে। পাখির কাকলি, মোরগের ডাক শোনা যায়। গুরুতর শব্দে মাদল, ঢোল বেজে ওঠে। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে— একটি সমবেত সঙ্গীতের সুর শোনা যায়...)

রণে সাজিল রে
রণ ডংকা বাজিল রে
তেভাগা শুরু হইল দেশে।।
ছুটে আয় চাষী ভাই
সমান সমান মানা নাই
ফসলের তিনভাগ চাইরে।।
আজি এ ভীষণ রণ
হয় জিত নয় মরণ
নাম সব চাষী আজ মাঠে।।
হুংকারে শত্রু পালায় ভয়ে
তেভাগা শুরু হইল দেশে।।"

নাটকের পরিশেষে আমরা দেখতে পাই, এই আধিয়ার তথা বর্গাচাষীদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র যশোদা বর্মণের নেতৃত্বে উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ বর্গাদারদের (Share-croper) এবং ১/৩ অংশ জোতদারের— এই দাবি নিয়ে বর্গা ভাগচাষী কৃষকরা আন্দোলনে নেমে শাসক অর্থাৎ সামন্তপ্রভু তথা জোতদারের প্রবল ও কঠোর বাধা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তেভাগার দাবি আদায় করে সফলতা অর্জন করে জেলা তথা বাংলার বুকে এক নজিরবিহীন আন্দোলনকে মধ্য দিয়ে সে আন্দোলন সর্বোপরি বিপ্লবী চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে শ্রেণি সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে। মোটকথা এই শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে জেলা তথা বাংলার বুক চিড়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদার-জোতদারদের বর্গাচাষীদের শোষণ প্রক্রিয়ার একটি করুণ বিদারক ও বাস্তব আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এই নাটকে জীবন্তরূপে বিধৃত হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্বনামধন্য বিশিষ্ট নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত 'খারিজ' (প্রকাশকাল, ১৯৯৬ খ্রি:) নামে সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকে নায়ক তথা প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বণমালী নিজের সৃষ্টি করা ফাঁদে নিজেই ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে এবং সর্বশান্ত হয়। তার নিজের কৃষি মজুর

নগেন কর্তৃক উপস্থিত বুদ্ধির মারফৎ— এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব রূপ এই নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'খারিজ' নাটকের কাহিনী মূল অংশে লক্ষ করা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ সমাজের একটি গরিষ্ঠ অংশ হল সাধারণ কৃষিজীবী কৃষক। কেন্দ্রীয় চরিত্র বনমালী গ্রামীণ সুদখোর মহাজন এবং সাধারণ ধনবান গৃহস্থ। তিনি গ্রামের গরীব কৃষকদের নানা রকম শোষণ প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আবদ্ধ করে নিজের সুবিধা মাফিক তাদের অমানবিক শোষণের মধ্য দিয়ে নিষ্পেষিত করেছেন। মোটকথা, গ্রামের গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বনমালী চিরায়ত সুদখোর বৃত্তির চক্রজালে তাদের চিরতরে বাঁধে এবং পরিণামের ফলস্বরূপ দেখা যায়, সেই অসহায় সাধারণ কৃষকদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিই তার অধিকারে নিয়ে এসে উপভোগ করে। একদিন ঘটনাক্রমে বনমালী তারই কৃষিমজুর-নগেনকে নকল ডাকাত সাজিয়ে তার কাছে গচ্ছিত ও বন্ধনীকৃত ধনরাশি সম্পূর্ণ রূপে চিরতরে আত্মসাৎ করার মানসে তার বাড়িতে নকল ডাকাতি করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলে দেখা যায় নকল ডাকাত নগেন এই সুযোগকে কাছে লাগিয়ে সকল গরীব কৃষকদের জমি, সোনাদানা, ঘটি-বাটি সহ শরীর বন্ধক রাখার হিসাবের খাতাটি পর্যন্তও নিজের হাতে তুলে নিয়ে গ্রামের সকল গরীব মানুষের সঙ্গে নিজেকেও অর্থপিশাচ ও মহাজনী কায়দায় শোষণকারী বনমালীর ঋণজালের চক্র থেকে খারিজ করে নিয়ে বলে— ''শুধু মোর নয় মণ্ডল, আইজ রাতে আমি ব্যাবাক গরীব মানুষ গুলানক খারিজ দেমো।''

'খারিজ' নাটকের কাহিনীর পরিণতিতে পৌঁছে পরিলক্ষিত হয় প্রতিনায়ক নগেন নায়ক তথা প্রধান চরিত্র বনমালীর কাছ থেকে গ্রামের সাধারণ গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি বা খারিজ করে দেওয়ার ব্যবস্থা তথা সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় ভাবে এ জেলার গরীব কৃষকদের এক করুণ বিদারক ও মর্মদায়ক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রাণবন্ত সত্যকে নাট্যকার এ নাটকে বেশ যত্ন সহকারে পরিস্ফুটিত করে আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগরিত করে তুলেছেন।

এছাড়াও হরিমাধব মুখোপাধ্যায় রচিত আরও কয়েকটি নাটকে এ জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থার বাস্তব সম্মত খণ্ডচিত্র বিধৃত হয়েছে। যথা—'পনন', 'পত্রশুদ্ধি', 'গণেশ গাথা' ইত্যাদি নাটকে।

নাট্যকার জিষ্ণু নিয়োগী সম্প্রতি তাঁর রচিত 'জলপোকা' নাটকের কাহিনীর শুরুতেই দেখিয়েছেন বাংলাদেশের পাবনা জেলার জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা অভিবাসী হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের খিদিরপুর অঞ্চলে আত্রেয়ী নদীর তীরে হালদার পাড়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। এই ধীবর বা জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা জীবিকার প্রধান উৎস হিসেবে

আত্রেয়ী নদীতে নৌকা ও জাল নিয়ে সারাবছর মাছ সংগ্রহ করে এবং তা বাজারে বিক্রয় করে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করে। অর্থাৎ এই আত্রেয়ী নদীকে কেন্দ্র করেই জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন সংগ্রামের করুণ বাস্তব কাহিনী জলপোকা নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু কালের বিবর্তনে দেখা যায় এই আত্রেয়ী নদীর জলের নাব্যতা কমে গিয়ে সম্প্রতি খরস্রোতা হয়ে পড়ে, এমনকি জলে মীন বা মাছের অভাব হয়ে পড়ায় জেলেদের বা ধীবরদের জীবনযাত্রার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। আগের মতো আত্রেয়ী নদীকে কেন্দ্র করে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ায় তারা বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় অর্থাৎ মিলে (চালকলে) কাজ করে জীবন অতিবাহিত করে। মোটকথা সাম্প্রতিক কালে কৃষি ও যন্ত্রসভ্যতার (নগর সভ্যতা) মিশ্রণের প্রভাবে জেলার আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর এক বিবর্তিত রূপ এই 'জলপোকা' নাটকে বেশ স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

এই 'জলপোকা' নাটকের প্রধান চরিত্র মুরারির সঙ্গে হারানোর কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন সংকট বিশেষ করে সম্প্রদায়গত জীবিকার দুর্দিন, সেই সুবাদে বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় ধাবিত হওয়া— এ সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব সত্য উপলব্ধি করা যায়। এই নাটকের শুরুতে লক্ষ করা যায় বৃদ্ধ মুরারী বয়সের ভারে কর্মক্ষমহীন হয়ে এবং অকর্মক ছেলের উপার্জনহীনতার কারণে সংসারে নিত্য অভাবের জন্য মানসিক কষ্টে বেশির ভাগ সময় নদীর তীরে এসে উদাসমনে বসে থাকেন, এইভাবে সময় কাটাতে কাটাতে একদিন কোনো একমনের হাঁটার শব্দ শুনে তিনি বলে ওঠেন— কেগ যায়?

হারান : আমি কাহা হারান।

মুরারী : কোন্ থনে অ্যাইলা?

হারান : কেন্ কাহা, আমিতো এহন মিলোৎ কাম করি। তা তুমি এতো বেলায় এহানে বইস্যা কি করো?

মুরারী : কি আর করি, নদীর চলন দেহি আরে হারান, এড্ডু বইমন ক্যা। বুঝি তোমাগোরের কাম আছে, কিন্তু আমাগোরেক যে এক্কেবারে পাত্তাই দেওনা। য্যায়ো-য্যায়ো এই দুনিয়ার কেউ কি কারে জোড় কইর‍্যা আটকাইতে পারে। আমুলে তোমাগোরে দ্যাখলে মনের দুটা কথা কহন যায় তাই— অমূল্য ভাল আছে?

হারান : ঐ আছে কাহা, তুমার ঐ ত্যালপরা লাগাইবার পর থিক্কা এহন উইঠ্যা বইসবার পারে। ব্যাদনাড়া আছে। তবে আগের চাইতে কম।

মুরারী : হ হামাগোরের তো সময় হইয়্যা অ্যাসলো। এহন তার ডাকের উপেক্ষা! সত্যি

কই আর এ বুঝা কহন যায় না—

হারান : ও কথা কও ক্যান? তুমরা হইল্যা গিয়া সংসারের বটগাছ, তোমাগোরের পর, ঐ যে দ্যাখছাও না— ঝুড়িগুলা— আমরা হইলাম গিয়া তাই।

মুরারী : সিড্যা বোঝো? তুমার বাপের কপালডা ভালো বোঝনদার ছিল্যা পাইছে। আজের ছিলা-পুলরো ভাবে বুড়ারাই যতো জঞ্জাল। (দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে)

হারান : বুইঝবো না ক্যান? কাহা আমি যিড্যা কই শুনো, এহন ঘরে যাও, অনেক ব্যালা হইছে।

মুরারী : হারানরে নদীডারে দ্যাখছাও! কেমন মরা সাপের মতো পইর‍্যা থাকে না? নরেও না চরেও না, অথুচো এই আত্রাই মা আমার কতুজনের প্যাটের ক্ষুধা মিটাইছে কও?

হারান : সিঠা ঠিক— তুবে কাহা, তহন কিন্তু ম্যানুষ কম ছিলো। নদীর জল ছিলো, এহন তো নদীক ম্যানুষ নর্দমা বানাইছে। বাড়ী-ঘরের জাই-জঞ্জাল-পিলাসটিক ফিল্যা নদীর চলন বন্ধ কইরছে, নদীও গুমোঠ হইছে— তুমি আত্রাই কও, সিদিন মিছিলোৎ কুলকাতায় গিছিল্যাম— এহইদশা, উ শালারা গঙ্গাক মা কয়—আর যুতো নুংরা নিয়া য্যায়া ফ্যালে ঐ মা গঙ্গার বুকে!

মুরারী : শিক্ষিত মানষেরা মুখ্য মানষের মত কাম ক্যান করে?

হারান : সিদিন বলে, পেপারেত দিছে— মালিক পইরত্যাছিল, শুইনল্যাম ত্রিশ শালের পর, মানুষ বলে খাবার জলই পাবে না।

মুরারী : জলেরে নিয়া মানুষ যা করে— সিডাই তো কই দাঁত থ্যাকইতে দাঁতের মূল্য দ্যায়না কেউ। জলরে নিয়া তাচ্ছিল্য কইরব্যা— জল তুমাগোরে বুঝায় ছ্যাইরবে। তার মুখ গুমুঠে দুষ কুথায়? কইয়্যা দিলাম দেহ, একদিন ম্যানুষ চিতা ধোয়াবার জল পাবে না। ঠিকই তুমার কথা-জল থ্যাকলেই তো মাছ? সব ক্যামন যেন হইয়া গেল না হারান?

হারান : ন্যাও একডা বিড়ি খাও।

মুরারী : দ্যাও অ্যাডা। ভয় হয় হারান, আমাগোরে এই জ্যাতটাই দিখব্যা একদিন ব্যাঁজাত হইয়া গ্যাছে গিয়া। নদীত জল নাই, জলে মাছ নাই, অ্যাডা জলপুকা সেও জলডায় বসে না। এরপর আমাগোরের ছেলেপুলেরা কি কইরবে? ওর থনেই যতো ভয় হয় বুইঝলানা?

হারান : না! উঠি কাহা-উসব চিন্তা কইর‍্যা কি কইরব্যা? ইডাতো তুমার— আমার হাতে নাই, কপালের যা লিখন আছে, সেই মাফিকই চইলব্যার হবে। যাও এহন বাড়ী যাও।...”

মোটকথা নদীর নাব্যতা হারানোর ফলে জলসংকট ও জলদূষণ প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে। এমনকি নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার দেশব্যাপী এই যে সংকট তা অনেকটা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। এই নাটকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তথা একদা অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার আত্রেয়ী নদীকে কেন্দ্র করে পণ্য সামগ্রী পরিবহণজাত ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল ও এই নদীর অফুরন্ত জলরাশির উপর নির্ভর করে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন যাপন খুব স্বাভাবিক ছন্দে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই আত্রেয়ী নদীর জল নাব্যতা হারিয়ে ক্রমশ জলসংকট ও জলদূষণ বেড়েছে। এমনকি নাব্যতা হারিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে নদীর বুকে চর বেড়িয়ে পড়ায় এই আত্রেয়ী নদীর তীরে বসবাসকারী খিদিরপুরের হালদার পাড়ার জেলে মাঝিরা আজ জীবিকার তাগিদে জাতিগত পেশায় কোন উপায় না থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়ে তারা অন্য নানান পেশাকে বেছে নিয়ে কাজকর্ম করে জীবন অতিবাহিত করছে। তাই নাটকে দেখা যায় হারান তাদের নিজস্ব পোশাকে অবলম্বন করে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে যখন কোন দিকেই সঠিক রাস্তা পায় না তখন সে জেলায় গড়ে ওঠা চালকলে কাজ নিয়েছে, তা তাদের জেলে সম্প্রদায়ের প্রবীণ ও মূল কাণ্ডারী মুরারীকে স্বতঃসচ্ছ ভাবে জানাতে বাধ্য হয়েছিল অর্থাৎ তাদের পেশাগত আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার কথা তার মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে তাদের ঘরের মহিলারাও যেন নানা প্রলোভনে ও অভাব অনটনের কারণে ব্যবসায়ীদের কাছে যেতে বাধ্য হচ্ছে এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে নানাভাবে তাদের ব্যবহার করছে। এমনকি নদীর নাব্যতা হারানোর মূলে যে মানুষ আজ ব্যাপকভাবে প্লাস্টিক, নানারকম নোংরা, বাড়িঘরের জঞ্জাল নদীর বক্ষে অবারিতভাবে ফেলে চলেছে তার ফলশ্রুতিতে এই দুর্ভোগ—প্রসঙ্গক্রমে এই কথাগুলিও উঠে এসেছে। মোটকথা আত্রেয়ী নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ার ফলে তার তীরবর্তী বসবাসকারী বালুরঘাট শহরের পার্শ্বস্থ খিদিরপুর অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের নিজস্ব জীবিকা মাছ ধরে জীবন যাপনের পেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাধ্য হয়ে সরে এসে অতিকষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন— তার বাস্তবসম্মত ছবি জীবন্তরূপে এই নাটকে জেলার বিশিষ্ট সুদক্ষ অভিনেতা ও নাট্যকার জিষ্ণু নিয়োগী তুলে ধরেছেন।

‘জলপোকা’ নাটকে এই জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের নানা লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়েও যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তার নমুনা বিধৃত হয়েছে। এই নাটকে দেখা যায় বিশেষ করে এক রাজনৈতিক নেতা (বিধায়ক) অনাথবাবু পুনরায় ভোট চাইতে বৃদ্ধ মুরারীর কাছে এলে উভয়ের

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই গ্রামের অভাবী জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের বঞ্চনা, সুযোগ বুঝে প্রতারণা ও তাদের দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে নেতারা তাদের ফাঁকি দেয় তার বাস্তব দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে চতুর রাজনৈতিক নেতা (বিধায়ক) অনাথবাবু যখন পুনরায় গ্রামের মাথা বৃদ্ধ মুরারীকে ভোট চাওয়ার নাম করে ঠকাতে আসে তখন মুরারী বলে ‘‘তোমার বাপের সময়ে কাশীপুরে সত্যঘোষের জমি দখলের লড়ায়ে ছিলাম। আজ তোমরা আমাদের দেখে মুখ ফেরাও। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দাও, নানা প্রস্তাব দিয়ে বাস্তবে তা করো না।’’ বৃদ্ধ মুরারীর স্থানীয় নেতা অনাথবাবুর উপর ক্ষোভের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উক্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত এই নাটকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এই নাটকটির কাহিনীর পরিশেষে হালদার পাড়ার বৃদ্ধ মুরারীর পারিবারিক অভাব-অনটনের চাপে ক্রমশ ক্লিষ্ট হয়ে ভেঙ্গে পড়েন। একমাত্র ছেলে উপার্জনহীন ও মদ্যপ হওয়ার ফলে বৌমা কৌশল্যা সংসার চালাতে গিয়ে পেটের জ্বালায় চরিত্রহীন হয়ে পড়ে এবং তার ফলে গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উঠে যায় যা পিতা হয়ে বৃদ্ধ মুরারী সত্তা থেকে মেনে নিতে পারেনি। সেই সঙ্গে পাড়ার স্বজাতি মানুষদের জাতিগত পেশা আত্রেয়ী নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ার সুবাদে বন্ধ হয়ে যায় তাই তারা বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয় এবং তাদের জীবন যাত্রায় অন্যমাত্রা দেখা দেয়। মোটকথা জাতিগত পেশা হারিয়ে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের যে আর্থ-সামাজিক করুণ দৈন্যদশা ও অভাবের তাড়নায় ছিন্নভিন্ন অবস্থা, তা মুরারীকে ব্যথিত ও বেদনাতুর করে তোলে। সর্বোপরি এই সব উদ্ভূত সমস্যা ও দুশ্চিন্তা তাকে তাড়া করে বেড়ায় এবং নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বৃদ্ধ মুরারী পাড়ার কংগ্রেস ঘাটের দহে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে জলপোকার মতো মরে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার কবলে পড়ে হালদার পাড়ার মাথা বৃদ্ধ মুরারীর শেষ পরিণতি ভীষণ মর্মান্তিক, করুণ ও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এই জলপোকা নাটকে তার নজিরবিহীন ও অভাবনীয় বাস্তবোচিত সত্যরূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১. ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জমান - ‘দিনাজপুরের ইতিহাস, (১৭৬৫-১৯৪৭) গতিধারা, ৩৮/২ ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১৬

২. শিবশঙ্কর মুখার্জী - ঔপনিবেশিক যুগে দিনাজপুরের কৃষি/ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, পৃ. ২৩০

৩. সমিত ঘোষ - ‘দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও

ইতিহাস', অমর ভারতী, কলকাতা-০৯, ১ম
প্রকাশ-নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩৮৩

৪. শিবশঙ্কর মুখার্জী - 'ঔপনিবেশিক যুগে দিনাজপুরের কৃষিভিত্তিক
আর্থ-সামাজিক কাঠামো, পৃ. ২৩১, ২৩১

৫. মুকুল বসু - 'দক্ষিণ দিনাজপুর' জেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট,
শারদীয় প্রত্যূষ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, দশম বর্ষ, সম্পাদক-
কৃষ্ণপদ মণ্ডল, পৃ. ১৭৩

৬. মন্মথ রায় - 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব
প্রসঙ্গে। নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর,
সম্পাদক-শিশির মজুমদার, পৃ. ৩

৭. ড. অপরেশ লাহিড়ী - উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্য এক্ নাট্যচর্চার ইতিহাস,
বইওয়ালা, কলকাতা-৪৮, প্রকাকাল ১৯৭৩,
পৃ. ২৭৮, ২৭৯

৮. পল্লবিত পঁচিশ বছর, 'ত্রিতীর্থ', ১৯৬৯-১৯৯৪, রজতজয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা।

৯. অর্ধাপক নির্মলেন্দু তালুকদার - 'পশ্চিম দিনাজপুর নাট্যচর্চায় বালুরঘাট, মধুপর্ণী,
পঞ্চবিংশ বর্ষ, পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৩৯৯,
সম্পাদক-অজিতেশ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪১১